সমাজ বিপ্লব

বা

ব্রাহ্মণ আন্দোলন

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্‌
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ"

শ্রীদীনবন্ধু আচার্য্য বেদশাস্ত্রী

সহকারী-সম্পাদক, আর্য্যসমাজ, কলিকাতা।

প্রকাশক—

শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ

১ম সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৩৬।

[মূল্য ।/০ পাঁচ আনা মাত্র।

প্রকাশকের নিবেদন।

সংস্কার-বিরোধী স্বার্থান্বেষীদের প্রতি আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। নিরপেক্ষ, সরল-হৃদয়, সত্যানুসন্ধিৎসু দেশও সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী পাঠক মাত্রই বুঝিতে পারিবেন—সম্প্রদায় বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষের প্রাণে আঘাত দেওয়া এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। যে সব অন্ধ-সংস্কার গুপ্ত বিষ-ব্রণের মতো সমাজ শরীরে পুঁজ-ক্লেদময় গলিত ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে অস্ত্রোপচার ও অমৃত প্রলেপ দিয়া সমাজদেহকে নীরোগ, স্বস্থ ও সুগঠিত করাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। প্রত্যেক মানবের শরীর একই উপাদানে গঠিত। রক্ত মাংস অস্থি বিশ্লেষণ করিলে জাতিভেদের কোন চিহ্নই দৃষ্ট হয় না অথচ মিথ্যা জাতিভেদ, বংশগত অসার কৌলীন্য ও উচ্চ নীচ বোধ সমাজে ভেদ-বৈষম্য হিংসা-কলহের সৃষ্টি করিয়াছে। কোটি কোটি নরনারী আজ বেদ, ভগবান ও গায়ত্রী মন্ত্র হইতে বঞ্চিত। এই পরিদৃশ্যমান জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড বা সৌরজগতে আমাদের যেমন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—বেদ, ভগবান ও সাবিত্রী-মন্ত্রে তেমনই অচ্ছেদ্য অধিকার। তাহাদের অধিকার না দিলেও তাহারা বলপূর্ব্বক আদায় করিবে। মান-অপমান, জয়-পরাজয় ও লাভ-ক্ষতির তুচ্ছ আত্মম্ভরিতা ত্যাগ করিয়া আজ জাতি ও দেশকে বাঁচাইতে হইবে। সত্য প্রচার করিতে গেলে অনেকেরই কষ্ট বোধ হয় কিন্তু তাহা বাঞ্ছনীয় নহে।

মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই এই গ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশ করিতে হইয়াছে তজ্জন্য যে সব ছাপার ভুল রহিয়া গেল দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংশোধন করা যাইবে।

শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, সিরাজগঞ্জ, পাবনা।



ধর্ম্মসমন্বয় সংঘ-প্রতিষ্ঠাতা

তত্ত্ববিশারদ পণ্ডিত শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক আর্য্য F.T.S.

উৎসর্গ।

যিনি এই বঙ্গদেশে লুপ্ত প্রায় বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের জন্য মনঃ প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন! জাতি ভেদ উচ্ছেদ, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, শুদ্ধি, সংগঠন ও বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিতে যিনি অশীতি বর্ষ বয়সেও অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন—বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা, সাম্য ও ভ্রাতৃভাব স্থাপনের জন্য যিনি ইংরাজী, হিন্দি ও বঙ্গ ভাষায় নানাবিধ গ্রন্থ লিখিয়া পরস্পর বিবদমান জনসমূহের মধ্যে ঐক্য, প্রীতি ও সোহার্দ্দের মঙ্গল ধ্বনি শুনাইয়াছেন—যিনি ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নিষ্ঠা, ভক্তি, সচ্চরিত্রতা, ঔদার্য্য, পাণ্ডিত্য, সরলতা, মাধুর্য্য ও ধর্ম্মপ্রাণতায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন—সেই দানবীর দেশসেবক, ধর্ম্মপ্রাণ. ঋষিপ্রতিম ধর্ম্মসমন্বয় সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত **বলাইচাঁদ মল্লিক** আর্য্য এফ্, টি, এস, মহোদয়ের কর-কমলে এই ক্ষুদ্র উপহার স্নেহের প্রতিদান স্বরূপ অর্পিত হইল।

সাগরকান্দী
পাবনা
বাং ১—৪-৩৬

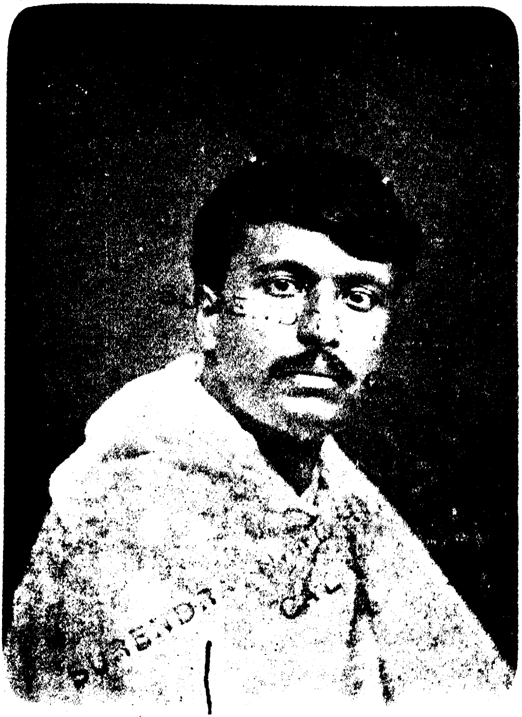
স্নেহমুগ্ধ
শ্রীদীনবন্ধু আচার্য্য।

উদ্বোধন।

বাঙ্গালার ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় দিন। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ১০ই চৈত্র কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কয়ারে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রস্তাব উঠিল—"এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যেহেতু পূর্ব্বকালে সকলে একই ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত ছিল, গুণ ও কর্ম্মভেদে বর্ণভেদের উৎপত্তি হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে কোনবর্ণই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিতে অবস্থিত নহে, পরস্পরের বৃত্তি পরস্পরে গ্রহণ করিতেছে ও তাহাদিগকে এখন পূর্ব্বের ন্যায় গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে বিভাগ করিয়া বর্ণ বিভাগ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব অথচ বর্ত্তমান আকারের জাতি-ভেদের ফলে উচ্চ নীচ বোধ ত্যাগ করিয়া কোনও প্রকারেই হিন্দু জাতি সংঘবদ্ধ হইতে পারিতেছে না, উত্তরোত্তর ভেদবুদ্ধি প্রখরতর হইতেছে; অতএব পূর্ব্বকালে যেরূপ সকলেই একবর্ণে প্রতিষ্ঠিত ছিল, হিন্দুমাত্রেই পিতৃবর্ণ ব্রাহ্মণবর্ণে প্রতিষ্ঠিত ছিল এখন আবার হিন্দুমাত্রেই পিতৃবর্ণ ব্রাহ্মণবর্ণে প্রতিষ্ঠিত হউক।" প্রস্তাবক শ্রীদীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী; অনুমোদক ও সমর্থক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, পদ্মরাজ জৈন, মদনমোহন বর্ম্মণ, পণ্ডিত বলাইচাঁদ মল্লিক প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ না উঠাইয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকান্ত বেদান্ত শাস্ত্রী এক সংশোধক প্রস্তাব উঠাইলেন যে সকলকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে এক বৎসর সময় দেওয়া হউক। ইহার সমর্থন করিলেন সম্মেলনের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের পুত্র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য এম-এ, প্রভৃতি কয়েক জন। দুই পক্ষেই বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই সভায় ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। মূল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিতে আসিলেই সভাস্থ

প্রতিনিধিবর্গ চীৎকার করিয়া বক্তাকে নিরস্ত করিতে লাগিলেন সভাপতি মহাশয় সভার শৃঙ্খলা বিধান অসম্ভব বুঝিয়া সভা ত্যাগ করিলেন। পরদিন প্রাতে সভাপতি মহাশয় সভার সভাপতিত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় স্বামী জ্ঞানানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মূল প্রস্তাব ও সংশোধক প্রস্তাব প্রকাশ্য সভায় উত্থাপিত হইল। সংশোধক প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল এবং ভোটাধিক্যে তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে মূল প্রস্তাব গৃহীত হইল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাশ এম, এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মল্লিক ও শ্রীদীনবন্ধু বেদ শাস্ত্রী তৎক্ষণাৎ বৈদিক যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সেই সময়ে সভা ক্ষেত্রেই ৪।৫ শত হিন্দু বৈদিক সংস্কার দ্বারা যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বঙ্গদেশের হিন্দু সমাজে ভীষণ বিপ্লব বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বঙ্গের নানা স্থানে শূদ্রত্ব ত্যাগ করিয়া শত শত হিন্দু যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে লাগিল। উক্ত সম্মেলনের পর প্রায় এক মাস মধ্যে শুধু ২৪ পরগণা জেলাতেই ত্রিপুরা নগরে ৩৫৯, খুনখালি ২০৭, আগুতি ১১৭৪, চণ্ডীপুর ও রামদেবপুর ৪৬৭, সীতাকুণ্ড ৬৭ এবং কাঁঠালবাড়ী গ্রামে ৩৬ জন হিন্দু যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ স্থাপন করিয়া হিন্দু সমাজের বক্ষে শক্তিশেল বিদ্ধ করিয়া দিলেন। রঘুনন্দন ঘোষণা করিলেন—বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ বাদে বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখ হইতে মুচি, মেথর, মুদ্দাফরাশ পর্য্যন্ত সকলেই ঘৃণ্য শূদ্র। সমগ্র ভারতে শূদ্র কথিত নরনারী বেদ পাঠ, প্রণব মন্ত্র ওঁকার উচ্চারণ ও স্বহস্তে ভগবদুপাসনার নাম শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিত। বেদচর্চ্চা ও ঈশ্বর আরাধনা ব্রাহ্মণের একচেটিয়া ছিল। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিম উপকূলে গুজরাট প্রদেশে এক মহাপুরুষ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী জন্মগ্রহণ করিয়া

পদদলিত নিগৃহীত শূদ্র জাতিকে অভয়বাণী শুনাইলেন—"বেদ ও ভগবান শুধু ব্রাহ্মণের একচেটিয়া নয়; চন্দ্র-সূর্য্য নক্ষত্রাদি, আলো বাতাসে যেমন সমগ্র মানব জাতির সমান অধিকার, তেমনই বেদ ও ভগবানে ব্রাহ্মণ-শূদ্র, খৃষ্টান-মুসলমান, ইহুদী-পার্শী, নিগ্রো-সাঁওতাল সকলেরই সমান অধিকার। যে সব পাষণ্ড মানব জাতিকে বঞ্চনা করিয়া জগতের সুখ সুবিধা নিজেরা ভোগ করিতে চায় তাহারা দস্যু, লুণ্ঠনকারী ও মানব জাতির শত্রু। সেই সব দাম্ভিক প্রবঞ্চক স্বার্থপরদের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। ভগবানের প্রতিনিধি বা বরপুত্র হইয়া কেহই জগতে জন্মগ্রহণ করে নাই সকলেই তাঁহার প্রিয়পুত্র। পিতার ঐশ্বর্য্যে সকল পুত্রেরই সমান অধিকার। বেদ বা জ্ঞান ভগবানের প্রেরিত বস্তু কোনও জাতি বিশেষের পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। ইহাতে সকলেরই তুল্য অধিকার। বৈদিক যজ্ঞোপবীত সংস্কার মানব মাত্রেই গ্রহণ করিতে পারে।" তিনি ঘোষণা বাণী প্রচার করিয়া দেরাদুন সহরে এক পাঠান মুসলমানকে যজ্ঞোপবীত দান করিয়া নাম রাখিলেন "অলখধারী", তাঁহার ঐ রুদ্র আহ্বানে ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক দ্বিজত্ব গ্রহণ করিল—যজ্ঞোপবীত ধারণ করিল। সে আজ ৬০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। দেখিতে দেখিতে বঙ্গদেশেও সে ঢেউ আসিয়া লাগিয়াছে। বাঙ্গালার স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন! তুমি আজ প্রেতলোকে কি ব্রহ্মলোকে জানি না। একদিন নবদ্বীপের টোলে বসিয়া ঘোষণা করিয়াছিলে—"বাঙ্গালাদেশে সকলেই শূদ্র, কেবল আমরাই দুই-চার জন সনাতন ধর্ম্মের মৌরশী পাট্টাদার বামুন আছি।" দেখিয়া যাও, আজ বাঙ্গালার সমগ্র "শূদ্র" তোমাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতেছে। রঘুনন্দনের চেলা চামুণ্ডা! তোমরাও অসার ব্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণ হও।



শ্রীদীনবন্ধু আচার্য্য বেদশাস্ত্রী।

সমাজ বিপ্লব বা ব্রাহ্মণ আন্দোলন।

ব্রাহ্মণের কীর্ত্তি।

"ব্রাহ্মণ" বলিতেই আজ বুঝি—মুষ্টিমেয় লোক যাঁহারা গুরু-রূপে শিষ্যদের পরকালের মুক্তির জন্য ব্যস্ত; বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে আম কাঁঠালের সময় দোদুল্যমান ভুঁড়ি লইয়া লম্বোদর মূর্ত্তিতে ভগবানের ট্যাক্স আদায় করিতে শিষ্যদের দরজায় গিয়া হাজির এবং ফাটা শ্রীচরণের ধুলি রাশি রাশি শিষ্যকে পান করাইয়া যাঁহারা জীবনকে সার্থক করেন। ব্রাহ্মণ কখনও শিষ্য বাড়ীর পরম ভক্ত গুরু গত প্রাণ, যুবক-যুবতীদের দ্বারা বিরাট শ্রীভুঁড়ি ও শ্রীঠ্যাং এ তৈল মর্দ্দন করাইয়া মধ্যে মধ্যে অস্পষ্টস্বরে সাধন ভজনের গূঢ় রহস্যগুলি নিজগুণে শ্রীমুখে ব্যক্ত করেন, কিংবা পুরোহিতরূপে যজমানের উকীল সাজিয়া ভগবানের আদালতে দুই চারি আনা কোর্ট ফি বা দক্ষিণার লোভে সারারাত্রি জাগিয়া "মা কালী"কে ছাগ মহিষের তাজা রক্তের লোভ দেখান এবং যজমান পুত্রের ব্যাধি শান্তির প্রার্থনা জানান। কখনও বা ইঁহারা যজমানের মৃত মাতাপিতাকে লেজ ধরিয়া বৈতরণী পার করাইতে এক জোড়া বলিষ্ঠ গাভী যাচ্ঞা করেন, রৌদ্র বৃষ্টি শীতাতপ হইতে রক্ষা করিতে ছাতা জুতা পালঙ্ক ও বিছানার ফর্দ্দ প্রস্তুত করেন, কখনও রাহু কেতু মঘা অশ্লেষার অশুভ দৃষ্টি হইতে যজমান পুত্রকে রক্ষা করিতে যাগযজ্ঞের আয়োজন করেন। ইঁহারাই মোহান্ত বা পাণ্ডারূপে ভগবানের ঠিকেদারী বা দালালী করিয়া এবং বিনামূলধনে দেব বিগ্রহের ব্যবসায় খুলিয়া রাজপুত্রের ন্যায় ভোগ সুখে কালাতিপাত করেন। ইঁহারা ভাগবত পাঠক বা প্রভুপাদ গোস্বামী (Vaish-nab I. C. S.) রূপে সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের মার্কা বা সিল্ মোহর মারিয়া হাতে হরিনামের থলি (Chaitanya bag)

ঝুলাইয়া ধনী বৈষ্ণবের বাড়ীতে বস্ত্রহরণ, রাসলীলা, পরকীয়া রস বা যুগল উপাসনার মধুর রস পরিবেশন করেন। ব্রাহ্মণই পাচকঠাকুর বা বাবুর্চ্চি রূপে—অত্রি যাজ্ঞবল্ক্য বশিষ্ঠের বংশধর হাতা খুন্তি হাতে ধনীর পাকশালায় কৃষ্ণ পক্ষীর কোপ্তা পাক করেন অথবা রেল ষ্টেসনে পানিপাঁড়ে রূপে জলের বালতি হাতে করিয়া ট্রেণের দরজায় দরজায় ছুটাছুটি করেন ও ব্রাহ্মণত্বের ষোল আনা দাবী করেন। ব্রাহ্মণ শব্দ উচ্চারণ করিলেই আজ ঐ সব চিত্র ফুটিয়া উঠে। বিশ্বাসঘাতক রূপে ব্রাহ্মণই মুসলমানের সহিত যোগ দিয়া সিন্ধু দেশের হিন্দু রাজা দাহিরের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বক্তিয়ার খিলিজের নিকট হইতে ১১ লক্ষ টাকার লোভে ব্রাহ্মণ পশুপতি মিশ্রই বঙ্গের হিন্দু নরপতি লক্ষ্মণ সেনের পুত্র কেশব সেনকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যুদ্ধ করিতে নিরস্ত করিয়াছে ও বাঙ্গালার সিংহাসনকে বিদেশী আক্রমণকারীর হাতে তুলিয়া দিয়াছে। ব্রাহ্মণই গুরু গোবিন্দ সিংহের দুই শিশু পুত্রকে অত্যাচারী মোগল সম্রাটের নিকট ধরাইয়া দিয়া প্রাচীরের ভিতর প্রোথিত করিয়াছে এবং ছত্রপতি শিবাজীর মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যকে ব্রাহ্মণ অমাত্যগণ মিলিয়াই ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। কৃষ্ণ নগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, উমিচাঁদ ও নন্দকুমার প্রভৃতি কয়েকজন কুটিল ব্রাহ্মণই মিরজাফর ও ক্লাইভের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বাঙ্গালার সিংহাসনকে বিদেশী বণিকের হাতে তুলিয়া দিয়াছে এবং বিজয় নগরের ব্রাহ্মণ রাজার ভ্রাতা রাজারামই মান্দ্রাজ স্থলী ইংরেজ চরণে অঞ্জলি প্রদান করিয়া সথারূপে পরিচিত হইয়াছে। "ব্রাহ্মণ" শব্দ শুনিলেই আজ মনে হয় মহাপুরুষ শঙ্কর, ভক্ত রামানুজ, প্রেমিক চৈতন্যের প্রতি কি অমানুষিক অত্যাচার! মহাত্মা রামমোহন, দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র ও ধর্ম্মবীর-দয়ানন্দের প্রতি কি জঘণ্য পাশবিক আচরণ! ব্যবস্থাদাতা শাস্ত্রকাররূপে কোটী কোটী

শূদ্র কথিত নরনারীর উপর কি অমানুষিক নিপীড়ণ ও নির্ম্মম অত্যাচার! "ব্রাহ্মণ" শব্দের সহিত কতযুগের কত বর্ব্বরতা, অত্যাচার ও নীচতার মসিলিপ্ত ইতিহাস বিজড়িত। ভারতমহাসাগরের জলেও সে কালিমা ধৌত হইবার নয়। আজও দেখিতেছি যে সব "টুলো পণ্ডিত" শ্বেতাঙ্গের চটিজুতা দুই বেলা চাটিয়া জীবনকে সার্থক করে, "ম্লেচ্ছ" রাজ প্রদত্ত উচ্ছিষ্ট উপাধি মস্তকে ধারণ করিয়া পূর্ব্ব পুরুষের মহিমা ঘোষণা করে, দুইটী রৌপ্য-মুদ্রার লালসে আজ একরূপ ব্যবস্থা লিখিয়া দিয়া সমাজের ভয়ে কালই তাহা অস্বীকার করিয়া সত্যবাদিতার পরাকাষ্ঠা দেখায়, তাহারাই আজ সনাতন ধর্ম্ম-রক্ষায় কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে। কেহ ষাইট বৎসর বয়সে তৃতীয় পক্ষে বালিকা বধূর পাণি পীড়ন করিয়া কিংবা রক্ষিতা রমণীর অঞ্চলের কোণে বিবধার ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার জন্য হুহুঙ্কার ছাড়িতেছে। এখন ত তাঁহাদের সুন্দরবন বা ভাওয়ালের জঙ্গলে যাওয়াই উচিত! কেননা পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ। কেহ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লইয়া সাহেব পণ্ডিত সাজিয়া দেশে দেশে প্রচার করিতেছে "শূদ্রের বেদপাঠ বা প্রণবে অধিকার নাই" "জাতিভেদ উঠাইয়া দিলে বর্ণাশ্রম নষ্ট হইয়া যাইবে।" "যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যে গ্রহণ করিলে দেশ ও সমাজ ছারেখারে যাইবে।" এই সব ভণ্ড-ব্রাহ্মণ শূদ্রের মাথায় শাণিত করাৎ বসাইয়া এতদিন তাহার যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে, শূদ্রের উপর অকথ্য নির্ম্মম পাশবিক অত্যাচার করিয়া ৭ কোটিকে মুসলমান ও খৃষ্টান করিয়াছে। ইহাদের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া যখন "শূদ্র" দলে দলে অন্য ধর্ম্মে প্রবেশ করে, তখন ইহাদের সনাতন ধর্ম্মের জয়পতাকা বা লম্বাটিকির অগ্রভাগও দৃষ্ট হয় না। আজ তাহারা বেদ পড়িবে, ভগবানকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিবে, যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া প্রকৃত আর্য্যত্বের অধিকারী হইবে—এই শুভ কার্য্যে বাধা দিতে ব্রহ্মরাক্ষসগণ ~~আর্জ~~ মূর্খ জন সাধারণের নিকট সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার

দোহাই দিয়া ফিরিতেছে। এই সব ভণ্ড একদিন ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রারম্ভেও "ম্লেচ্ছ ভাষাং ন শিক্ষেত" ম্লেচ্ছভাষা শিখিওনা, ধর্ম্ম নষ্ট হইবে" এই কথা প্রচার করিয়া ধর্ম্মভীরু সরল জনসাধারণকে বিদ্যা-মন্দিরে ঢুকিতে দেয় নাই কিন্তু নিজের ছেলেদের স্কুল কলেজে ঢুকাইয়া এবং শ্বেতাঙ্গ পদে তৈল বিনোদন করিয়া সমাজের মধ্যে পশার জমাইয়া লইয়াছে। তাই আজ দেখি মহামহোপধ্যায় পণ্ডিতের ছেলেও এম্-এ. বি-এ, পাশ করিয়া সনাতন ধর্ম্মের বিলাতী ব্যাখ্যা করিয়া বেড়াইতেছে। এই সব পণ্ডিত বাবুদের সনাতন ধর্ম্মে দরদ্ কত! ইহারাই এককালে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া মোগল সম্রাটের নাগরাই জুতায় সেলাম ঠুকিয়াছিল ও শত শত শূদ্রকে মুসলমান করিবার পরামর্শ দিয়া পারিশ্রমিক স্বরূপ স্বর্ণ মুদ্রা দক্ষিণা লইয়াছিল।

কিন্তু সেই অতীতযুগে—যখন শত সহস্র জাতি বা উপজাতির সৃষ্টি হয় নাই, যখন পার্শী জৈন, বৌদ্ধ খৃষ্টান, হিন্দু-মুসলমান বলিয়া কোন শব্দই সৃষ্ট হয় নাই, এমন কি যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণের উদ্ভবই হয় নাই তখন "ব্রাহ্মণ" বলিতে বুঝাইত বিশ্ববাসী নরনারী। মনুর সন্তান মানব বা ম্যান এবং আদমের সন্তান আদ্মী—কিন্তু মনু ও আদম যখন পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণই করে নাই তখন একমাত্র ব্রহ্মের অগ্রজন্মা সন্তান "ব্রাহ্মণ" দ্বারাই জগৎ পরিপূর্ণ ছিল। তখন ধনীদরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ, চোর দস্যু, রাজা প্রজা, ব্যবসায়ী শ্রমজীবী, শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ—নরনারী মাত্রেই ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইত। তাই শাস্ত্রকারগণ একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন "সসর্জ্জ ব্রাহ্মণান্ অগ্রে।" (বায়ু পুরাণ)। পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ বর্ণই সৃষ্ট হইয়াছিল। "এক বর্ণ আসীৎ পুরা" পূর্ব্বকালে একই বর্ণ ছিল। ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্ব ব্রাহ্মমিদং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টংহি কর্ম্মণা বর্ণতাম্ গতঃ (শান্তি পর্ব্ব-মহাভারত)। পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণ বর্ণই ছিল কর্ম্মদ্বারা বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। একবর্ণ মিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীদ্যুধিষ্ঠির। কর্ম্ম

ক্রিয়া বিশেষেণ চাতুর্ব্বণ্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ (বজ্র সূচী ৭।১০) সর্ব্বেবর্ণা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মজাশ্চ সর্বে নিত্যং ব্যাহরন্তে ব্রহ্ম। সর্ব্বং বিশ্বং ব্রহ্ম চৈতং সমস্তং। (মহাভারত শান্তি ৩।৮৯।১৪১) মহাভারত পুরাণাদি সকল শাস্ত্রই এক-বাক্যে বলিতেছে—এই সমস্ত ব্রহ্ম সম্ভূত বর্ণ মধ্যে ইতর বিশেষ নাই! পূর্ব্বে জগতে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিল, মানুষের মধ্যে কোনও ভেদ ছিল না, কর্ম্মদ্বারা পরে বর্ণভেদ হইল। অত্রি সংহিতা বলিতেছে :—

দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।

পশু ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ। ৩৬৪

ব্রাহ্মণ দশ প্রকারের যথা,—দেব, মুনি, দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চাণ্ডাল। মহর্ষি অত্রির মতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চাণ্ডাল ইহারাও সকলে ব্রাহ্মণ। পশু ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে ইনি বলিতেছেন :—"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ। তেনৈব সচ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ। ৩৭২। অর্থাৎ গলায় মাত্র পৈতা করিয়া যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণত্বের গর্ব্ব করে, অথচ ব্রহ্ম তত্ত্ব জানেনা তাহাকে পশু ব্রাহ্মণ বলে। তাহার গলার পৈতা ও গো মহিষ ছাগাদির স্কন্ধের রজ্জু একই প্রকারের। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের প্রাচুর্য্যেই ত দেশ ও সমাজ রসাতলে যাইতে বসিয়াছে। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ বা নরগণ যখন শত্রুর হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিতেন তখন তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় (Military power) বলা হইত, কৃষি বাণিজ্য করিলে বৈশ্য (Trading class), সমাজ সেবা (Social Service) করিলে শূদ্র এবং শারীরিক পরিশ্রম না করিয়া চিন্তা শক্তির দ্বারা সমাজ সেবা করিলে তাঁহাদিগকে নূতন সংজ্ঞা বা উপাধি না দিয়া শুধু ব্রাহ্মণ বলা হইত। একই ব্যক্তির একই জীবনে বৃত্তি অনুসারে কখন ও ব্রাহ্মণ কখনও ক্ষত্রিয়, কখনও বৈশ্য ও কখন শূদ্র সংজ্ঞা হইত। এখন ও যেমন একই ব্যক্তি রোগী দেখিতে গেলে ডাক্তার, ঘরে আসিলে গৃহস্থ, কাছারীতে গেলে জমিদার বলিয়া

অভিহিত হয় পূর্ব্বকালে তেমনই এক মূল ব্রাহ্মণ বর্ণই চারিবর্ণে অভিহিত হইত। তখন ও বর্ণ বা জাতি বংশগত হয় নাই। পরবর্ত্তী যুগে সেই এক ব্রাহ্মণ বর্ণই ভাঙ্গিয়া চারি জাতিতে পরিণত হইল। কিছুকাল পরে পরস্পরের মধ্যে বিবাহ ও পান ভোজনাদি বন্ধ হইয়া যখন স্বর্গভূমি ভারত ভেদ বৈষম্য দ্বেষ হিংসার ঘৃণ্য নরকে পরিণত হইল, শূদ্র পশু জাতির নির্য্যাতন নিপীড়ন ও অত্যাচার ভারতের আকাশ বাতাসকে বিষাক্ত করিয়া তুলিল, তখন অবতীর্ণ হইতেন মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ। তাঁহার সাম্যবাদ ও প্রেমমন্ত্রের মারুত হিল্লোলে দলিত শূদ্র জাতি আত্মরক্ষা করিল। তিনি ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে সমান অধিকার দিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ ১৫০০ বৎসর বুদ্ধের প্রেম ধর্ম্মের প্লাবন ভারতকে ভাসাইয়া চীন জাপান দ্বীপদ্বীপান্তরেও গিয়া পৌছিল। ভারতে তখন একাকার। ব্রাহ্মণের অত্যাচার, নরবলি, পশুবলি হিংসাবিদ্বেষ, ঘৃণ্য কটাক্ষপাত তিরোহিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের আভিজাত্য ও অত্যাচার বিলুপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। বৈবাহিক আদান প্রদান, পান ভোজনাদি অবাধে চলিয়াছে। তখনই ভারতে স্বর্ণযুগ। মহারাজ অশোকের রাজধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া নিপীড়িত বিশ্ববাসী বুদ্ধের শরণাপন্ন হইলে, সাহিত্য শিল্প, কলা-সৌন্দর্য্যে ভারত জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিল। কিন্তু উত্থানের পর পতন অবশ্যম্ভাবী। যে দুই চারিজন জাতিগত অভিজাত ব্রাহ্মণ শিবরাত্রির শলিতার মত ভারতের এখানে সেখানে ভ্রমণ করিতেছিল, তাহারাই কাপালিক তান্ত্রিক, বামমার্গী আঘোরপন্থী প্রভৃতি রূপ ধরিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিল। বৌদ্ধগন তাহাদের ছলনায় মুগ্ধ হইয়া দেখিতে দেখিতে ঘোর তান্ত্রিক, বামাচারী, মদ্যমাংসাহারী, নরঘাতক রূপে পরিণত হইল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ ঘটিল। ঠিক এইরূপেই

এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বাঙ্গালা দেশে প্রেমাবতার গৌরাঙ্গের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। মুসলমান কাজী ও বাদশাহের অত্যাচারে যখন চৈতন্যদেব জর্জ্জরিত তখন তিনি প্রকৃত ভক্ত মাত্র ৩॥ জন পাইয়াছিলেন। জগাই মাধাইএর মত শত শত নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ তখন চৈতন্যের উপর অত্যাচার চালাইয়াছিল। শচীদেবীকে একঘ'রে পর্য্যন্ত করিয়াছিল। কিন্তু যখন মুসলমান রাজত্ব লোপ পাইল কাজীর অত্যাচার নিঃশেষ হইল—বৈষ্ণব ধর্ম্ম যখন জমিয়া উঠিল তখন চৈতন্যদেবের নামে ব্যবসায় খুলিতে ঘাটে পথে প্রভুপাদ গোস্বামী গজাইয়া উঠিতে লাগিল। ঘর হইতে কেহ শ্রীগৌরাঙ্গের কন্থা, কেহ যষ্ঠি, কেহ কাষ্ঠ পাদুকা, কেহ তুলসী মাল্য বাহির করিতে লাগিলেন; কেহ অদ্বৈত পরিবার, কেহ নিত্যানন্দ বংশ, কেহ শ্রীবাসের গোষ্ঠী এইভাবে বৈষ্ণবের মধ্যেও কৌলীন্য, আভিজাত্য ও বনিয়াদি বংশের মহিমা কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের নামে ঈশ্বরোপাসনা ত্যাগ করিয়া মানুষপূজা ও কর্ত্তাভজার দল সৃষ্ট হইল—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম রসাতলে গেল। এখন কতকগুলি আরামপ্রিয়, ভীরু স্বার্থপর ব্যবসায়ীর হাতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম। ঠিক এইরূপে তখন ব্রাহ্মণ ঢুকিয়াই বৌদ্ধধর্ম্মের ও সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ কীট প্রবেশ করিয়া সব আন্দোলনকেই এইরূপ পণ্ড করে। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের উপর অত্যাচারকারী নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের মধ্যে তখন অনেকে গোমাংসও সেবায় লাগাইতেন যথা—ব্রাহ্মণ হইয়া করে গোমাংস ভক্ষণ। ডাকাচুরি পরগৃহ দাহে সর্ব্বক্ষণ॥ (চৈতন্য ভাগবত)। সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কার আন্দোলনে এই শ্রেণীর লোকেই চিরদিন বাধা দিয়া থাকে।

বৌদ্ধযুগের ঠিক শেষভাগে ভারতে কয়েকজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। সেই সব বিকৃত বৌদ্ধগণকে দলে দলে যজ্ঞোপবীত দান করিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণ তৈয়ারী করিয়াছিলেন। উত্তর ভারতের এক

ভাষণ দুর্ভিক্ষের দিনে গোমতী তীরে নৈমিষারণ্যে অতিথিশালা বা অন্নসত্র খুলিয়া সারস্বত মুনি ৬০০০০ ষষ্ঠি সহস্র বৌদ্ধকে অন্নদান করিয়া যজ্ঞোপবীত দিয়া, বেদ পড়াইয়া ব্রাহ্মণ করিয়া লইলেন। (মহাভারত গদাপর্ব্ব ২২।৪, ৩৭, ৫১ ; ৮।৪১ ; ৯।৬)

কথং দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং দ্বিজোত্তমান্। বেদানধ্যা পয়ামাস পুরা সারস্বতো মুনিঃ। তস্যাং দ্বাদশ বার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং মহর্ষয়ঃ। বৃত্ত্যর্থং প্রাদ্রবন্রাজন্ ক্ষুধার্ত্তঃ সর্ব্বতো দিশাম্। সারস্বতং মুনিশ্রেষ্ঠ মিদমুচুঃ সমাগতাঃ। অস্মানধ্যাপয়স্ব…৪৬

শিষ্যাত্বমুপগচ্ছধ্বং বিধিবদ্ধি মমেত্যুত ৪৭ তস্মাদ্বেদাননু প্রাপ্য পুনর্ধর্মঃ প্রচক্রিরে।

ষষ্ঠিমুনি সহস্রানি শিষ্যত্বং প্রতিপেদিরে। ৫১

পূর্ব্বং কৃতযুগে রাজন্ নৈমিষেয়াস্তপোধনাঃ। বর্ত্তমানে সুবিপুলে সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে। ততো যজ্ঞোপবীতৈ স্তেতত্তীর্থং নির্মিমায় বৈ। নৈমিষে মুনয়ো রাজন্ সমাগগ্য সমাসতে। তত্র চিত্রাঃ কথা হ্যাসন্বেদম্প্রতি জনেশ্বর।৯।১৬।

শুধু ভারতেই নয় মহর্ষি কণ্বের প্রচেষ্টায় মিশরের ম্লেচ্ছগণও শুদ্ধ হইয়া, বেদ পাঠ করিয়া ও শিখাসূত্র ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিশ্র দেশোদ্ভবাঃ ম্লেচ্ছাঃ কাশ্যপেন সুশাসিতাঃ। সংস্কৃতাঃ শূদ্রবর্ণেন ব্রহ্মবর্ণমুপাগতাঃ। শিখাসূত্রং সমাধায়ঃ পঠিত্বা বেদমুত্তমম্। (ভবিষ্য পুরাণ প্রতি সর্গ খং ৪ অধ্যায় ২১)

শঙ্কর বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায় আচার্য্য শঙ্কর অগ্নিবংশজ ক্ষত্রিয় রাজাদের সাহায্যে দশকোটি বিকৃত বৌদ্ধকে শঙ্খধ্বনি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া পুনরায় বৈদিক ধর্ম্মে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে যাইতেন ও যতদূর পর্য্যন্ত শঙ্খধ্বনি পৌছিত ততদূর পর্য্যন্ত শুদ্ধ হইল বলিয়া ঘোষণা করিতেন। দলে দলে লোক আসিয়া যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিত ও নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিত।

গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা, কৃষ্ণা, গোদাবরী, তাপ্তী নদীতে ডুব দিয়া সহস্র সহস্র লোক যজ্ঞোপবীত গলায় দিয়া গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইত ও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিত। এইভাবে কত শত দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে। বৌদ্ধযুগে ক্ষত্রিয় প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াই বহির্ভারতে ভারতসাম্রাজ্য বিস্তৃত হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে এই সব নবজাত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য উচ্ছেদ করিয়া ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর লইলেন। যে বুদ্ধকে নাস্তিক বলিয়া কত ঘৃণা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা এতদিন পরে সেই বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর নবম অব-তার বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রাধান্যকে আরও দৃঢ় করিবার জন্য মূর্ত্তি ও প্রতিমা পূজার প্রচলন করিলেন। শত শত বৌদ্ধ মঠ ও বিহারে বৌদ্ধ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহারা পৌরহিত্য করিতে লাগিলেন। গয়া ও পুরীর মন্দির এখনও সাক্ষীস্বরূপ বর্ত্তমান। গয়ায় বুদ্ধদেবের পদচিহ্নকে বলা হইল বিষ্ণু পদচিহ্ন। পুরীতে এখনও বৌদ্ধ প্রভাবে জাতিভেদ শিথিল। বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য শিল্প, কলা, মূর্ত্তিপূজার নিদর্শনরূপে পরিচিত হইতে লাগিল, দলে দলে বৌদ্ধ আসিয়াও মূর্ত্তিপূজায় যোগদান করিল। এই সময়েই ভাগবত পুরাণ, শিবপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, গরুড়পুরাণ, বরাহপুরাণ, দেবী ভাগবত প্রভৃতি অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ রচিত হইল। নানারূপ দেব দেবীর অলৌকিক কল্পিত উপাখ্যান প্রচারিত হইল। কোটি কোটি দেশবাসীকে মূর্ত্তি ও প্রতিমা পূজক বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়া মুষ্টিমেয় পুরোহিত ব্রাহ্মণ পূজার চাবিকাঠী নিজেদের হাতে রাখিলেন ও মজা লুটিতে লাগিলেন। সুবিধাপ্রিয় দেশবাসী স্বর্গে পৌঁছিবার সোজা পথ (short cut) পাইয়া মূর্ত্তিপূজা না করিয়াও মূর্ত্তিপূজক বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে লাগিল। এইরূপে শত সহস্র লোকে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত প্রাধান্য স্থাপন করিল। প্রতিমা পূজায় কত আমোদ-প্রমোদ, মজা-তামাসা, সাজ-সরঞ্জাম, আয়োজনের ঘটা! কত ঝাড়লণ্ঠন, দীপমালা, আতসবাজী, লুচি-

সন্দেশ, মোহনভোগ, নৈবেদ্যের ধূম! কত ছাগ-মহিষ, ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, ঘি-মশলার ছড়াছড়ি! কত ঢাক-ঢোল, যাত্রা খেমটা, বেশ্যানাচ, মদ-গাঁজা মন্ত্র পাঠের রৈ রৈ কাণ্ড! কত ভিখারী-কাঙ্গালী, আত্মীয়-কুটুম্ব, অর্থ-প্রাচুর্য্য প্রদর্শন! এত মজা ছাড়িয়া কোন্ "বেয়াকুব" মনে মনে ঈশ্বর-চিন্তা করিবে! সুতরাং দেশবাসী নব আবিষ্কৃত মজাদার উপাসনা প্রণালী গ্রহণ করিয়া পুরোহিত ব্রাহ্মণের শ্রীচরণে আত্মবিক্রয় করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিল। এই করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। কিন্তু বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব নষ্ট হইল না। শঙ্করাচার্য্য বা কুমারিল ভট্ট কেহই বঙ্গদেশে পদার্পণ করিলেন না সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের পতাকা এখানে সমভাবেই উড্ডীন রহিল।

বঙ্গে ব্রাহ্মণের বংশবৃদ্ধি।

বৌদ্ধ প্লাবনে বঙ্গের ব্রাহ্মণাদি হিন্দু বেদ যাগযজ্ঞ সকলই ভুলিয়া গিয়াছিল। মুষ্টিমেয় গোঁড়া বৈদিক ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ প্লাবনের মধ্যে নিস্প্রভ অবস্থায় কাল কাটাইতেছিলেন। বৌদ্ধযুগে বঙ্গদেশে কয়েক কিস্তিতে ব্রাহ্মণ আগমন করে। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বঙ্গাধিপতি রাজা শশাঙ্ক—কান্যকুব্জের রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় যাগযজ্ঞ, শান্তি স্বস্ত্যয়ন কামনায় পশ্চিম ভারত হইতে একদল ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে আনয়ন করেন। পরে তাঁহারা গ্রহবিপ্র নামে পরিচিত হন। গৌড়াধিপতি মদন পালের সেনাপতি শূরসেন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজ্যস্থাপন করেন। ইঁহার অন্য নাম জয়ন্ত বা আদিশূর। এই আদিশূরও ১০৩৩ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। বর্ত্তমান রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ ইঁহাদেরই বংশধর। আদিশূর বৌদ্ধ ছিলেন—বৌদ্ধধর্ম্ম

ত্যাগ করিয়া পরে শৈব হন। তিনি কান্যকুব্জের রাজা চন্দ্রকেতুর কন্যা (যশোবর্ম্মদেবের পালিতা কন্যা) চন্দ্রমুখীর পাণিগ্রহণ করেন। আদিশূর পুত্রেষ্টীযজ্ঞের আয়োজন করিলেন কিন্তু বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে পাওয়া দুষ্কর হইল। রাণীর অভিলাষ অনুসারে তিনি কান্যকুব্জের রাজা বীর সিংহের নিকট কয়েকজন ব্রাহ্মণের জন্য বলাহক নামক দূত প্রেরণ করেন। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের "কারিকা"য় আছে—রাজা লিখিতেছেন "বঙ্গদেশে ন বিপ্রোঽস্তি বেদজ্ঞ যজ্ঞকারকঃ। পরাশরানিকঃ শান্তিঃ কথং যজ্ঞ ভবিষ্যতি॥" বঙ্গদেশে যজ্ঞ করিতে পারে এমন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নাই, পরাশর ও অনিক নামক ব্রাহ্মণেরা আছে। যজ্ঞ হইবে কেমন করিয়া? কান্যকুব্জ রাজের ভাট দূতকে বলিতেছেন—"পতিতং বঙ্গদেশন্তং ন শ্রুতং কিং ত্বয়া কচিৎ? অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ। তীর্থ যাত্রা বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কার মর্হতি॥" হে দূত! বঙ্গদেশ যে পতিত তাহা কি তুমি জান না? অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধে তীর্থযাত্রা ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। "অতো বঙ্গাখ্যদেশেতু গমিষ্যন্তি ন বৈদ্বিজাঃ। কথয়িষ্যসি ভূপালং তস্যেয়ং প্রার্থনা বৃথা॥" সুতরাং বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ যাইবে না। রাজাকে গিয়া বল তাঁহার এ প্রার্থনা বৃথা। আদিশূর এই উত্তর শুনিয়া সেনাপতি বীরবাহুকে সসৈন্যে কান্যকুব্জ আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন। বীরবাহু যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। এই যুদ্ধে কাশীরাজ বীরসিংহকে সাহায্য করেন। আদিশূর নিরুপায় দেখিয়া ইংরাজের মণিপুর দখলের মত এক ফন্দি আঁটিলেন। তিনি শত শত "অস্পৃশ্য" "হীনবংশ সম্ভূত" লোককে গলায় পৈতা দিয়া ব্রাহ্মণ সাজাইয়া ধনুর্বাণ হাতে গো-যানে সমরভূমিতে পাঠাইলেন। "ততঃ সপ্তশতাঃ গত্বা অস্পৃশ্যা হীনসম্ভবাঃ। বিপ্রবেশং সমাস্থায় গবারূঢ়া ধনুর্দ্ধরাঃ॥ নৃপাদেশেন তে সর্ব্বে নানা সজ্জা সমন্বিতাঃ। আজগ্মুঃ সমরং কর্ত্তুং সিংহনাদৈ রণানিরে॥" (মিশ্রকারিকা)। গো ব্রাহ্মণ ভক্ত রাজা বীরসিংহ গো-

ব্রাহ্মণ বধের আশঙ্কায় পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া সন্ধি করেন। বীরসিংহ এই সাত শত গবারূঢ় ব্রাহ্মণবেশী সৈনিককে বর দিলেন—"বরং সপ্তশতেভ্যোঽসৌ সৈনিকেভ্য দদৌমুদা। সপ্ত শতীতি বিখ্যাতাস্তেঽনিকা প্রাভবন্ তদা॥" (মিশ্রকারিকা)। অর্থাৎ কান্যকুব্জরাজের বরে এই "অস্পৃশ্য" সপ্ত শত সৈনিক ব্রাহ্মণত্বে প্রমোশন পাইলেন ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইলেন। বীর সিংহের আদেশে ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সৌভরি ও সুধানিধি এই পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বঙ্গ দেশে আসিলেন। সঙ্গে আসিলেন পাঁচজন কায়স্থ—দাশরথি বসু, মকরন্দ ঘোষ, বিরাট গুহ, কালিদাস মিত্র ও পুরুষোত্তম দত্ত। সপ্তশত সৈনিক বঙ্গদেশে ফিরিয়া গোপৃষ্ঠে আরোহণজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞাতিরা তাঁহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করিলেন না। রাজা তাঁহাদিগকে ১৮ খানি গ্রাম উপহার প্রদান করেন। তাঁহারা সপ্তশতী নামে এক পৃথক সমাজরূপে বাস করিতে লাগিলেন। পঞ্চ ব্রাহ্মণ যজ্ঞ সমাপনান্তে কান্যকুব্জে প্রত্যাগমন করিলে পতিত দেশে গমন হেতু পাতিত্য ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের আত্মীয় কুটুম্বেরা সমাজে গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারা ভগ্ন মনোরথ হইয়া পুনরায় বঙ্গদেশে আগমন করেন। বঙ্গদেশে ইঁহারা সপ্তশতীর কন্যা বিবাহ করিয়া ঘর সংসার করিতে লাগিলেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর ইঁহাদের কান্যকুব্জ বাসী বংশধরেরা শ্রাদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন কিন্তু সেখানে জ্ঞাতিগণ কেহই সে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারা এই সব মনদুঃখে বঙ্গদেশে আগমন করেন ও সপ্তশতীর গৃহে বৈবাহিক আদান প্রদান করিয়া বংশবৃদ্ধি করিতে থাকেন। বল্লাল চরিতকার লিখিতেছেন—

"তৈ রূঢ়া নৃপতের্বাক্যাৎ সপ্ত সপ্তশতাত্মজাঃ।
তদ্দৈববশতো জাতাস্তাসু সপ্ত সুতা বনা।
বরন্দরং গতাঃ পঞ্চ কনিষ্ঠৌ রাঢ় সংস্থিতৌ॥ (পূর্ব্ব খণ্ড ২২ ২৩)

সাতজন ব্রাহ্মণ রাজার কথায় ৭টী সপ্তশতীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। দৈবযোগে তাঁহাদের ৭টী পুত্র জন্মিল। ইহাদের পাঁচজন বরেন্দ্র দেশে ও ২ জন রাঢ় দেশে বাস করিলেন। আদিশূরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ভূসুর বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ভট্ট নারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ ও বেদগর্ভ এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে রাঢ় দেশে বাস করেন। ইহারা রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইলেন। বৌদ্ধ রাজাদের অধীনে যাঁহারা বরেন্দ্র ভূমিতে বাস করিতে লাগিলেন তাঁহারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হইলেন (কুলতত্ত্বার্ণব ৯৩।৯৭)। ভূসুরের পুত্র ক্ষিতিশূর রাঢ়ীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণের ঔরসজাত ৫৬ পুত্রকে ৫৬ খানি গ্রাম প্রদান করেন। এইরূপে রাঢ়ী ব্রাহ্মণের মধ্যে গ্রামের নাম অনুসারে ৫৬ গাঁই প্রচলিত হয়। বন্দ্য, গড়গড়ি, চট্ট, ঘোষাল, বটব্যাল, মুখোটি, পালধি, গাঙ্গলি, সাড়েশ্বরী, পূতিতুণ্ড্য, কাঞ্জিলাল, প্রভৃতি ৫৬টী গ্রামের নাম অনুসারে তাঁহাদের উপাধি হয়। রাজা বল্লাল সেনের নিকট হইতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণও পরবর্ত্তীকালে ১০০ খানি গ্রাম পাইয়া গ্রামের নামানুসারেই লাহিড়ী, চম্পটী, সান্যাল প্রভৃতি উপাধিতে পরিচিত হন। রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বৈদিক আচার যখন ধীরে ধীরে লুপ্ত হইতে লাগিল তখন ক্ষিতিশূরের প্রপৌত্র ধরাশূর ২২ গ্রামের সদাচারী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণকে কুলীন বা কুলাচল ও অবশিষ্ট ৩৪ গ্রামের আচার ভ্রষ্ট রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণকে শ্রোত্রীয় আখ্যা প্রদান করিলেন। বজ্রবর্ম্মার পৌত্র শ্যামল বর্ম্মা এই সময় বঙ্গদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম উচ্ছেদের চেষ্টা করেন। শান্তি স্বস্ত্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছা করিয়াও তিনি বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পাইলেন না। রাঢ়ী বারেন্দ্র প্রভৃতি সকলেই বৈদিক আচার ভুলিয়া বৌদ্ধ মতাবলম্বী হইয়াছেন। তিনি তখন পশ্চিম ভারত হইতে যশোধর, বেদগর্ভ, গোবিন্দ, পদ্মনাভ ও বিশ্বজিৎ এই পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে আনয়ন করেন· তাঁহাদের বংশধরেরাই পাশ্চাত্য বৈদিক নামে

খ্যাত। দাক্ষিণাত্যের চালুক্য বংশীয় রাজা বিক্রমাদিত্য যখন গৌড় ও কামরূপ আক্রমণ করেন তখন বঙ্গের রাজা ছিলেন মহীপালের পৌত্র বিগ্রহ পাল। এই সময় বহু দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ রংপুর, জলপাইগুড়ি, শিলেট প্রভৃতি স্থানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। কিছুকাল পর সেনবংশের রাজা বিজয় সেন দেখিলেন বৌদ্ধদের সংস্রবে পুনরায় বঙ্গের ব্রাহ্মণেরা বৈদিক আচার ত্যাগ করিয়াছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রায় সকলেই উপবীত ত্যাগ করিয়াছে, তখন তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে আর কয়েকজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে বৈদিক ধর্ম্মে দীক্ষা দিলেন। ইহারাই পরে দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত।

"একবাপের দুই বেটা দুই দেশে বাস। বুদ্ধ পাইয়া জাত খাইয়া করিল সর্ব্বনাশ॥ পৈতা ছিঁড়ি পৈতা চায়, বৈদিকে দেয় পাঁতি। কর্ম্ম পাইয়া ধর্ম্ম খাইল বারেন্দ্র অখ্যাতি॥" (রাঢ়ী বারেন্দ্র কারিকা)

বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল প্রথমে ছিলেন বৌদ্ধ তান্ত্রিক। ভট্টপাদ সিংহ গিরি তাঁহাকে শৈবধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া হিন্দু করিলেন। বঙ্গদেশ যেন কিছুতেই বৌদ্ধ ধর্ম্মকে ছাড়িতে চায় না। বল্লাল দেখিলেন ব্রাহ্মণেরা আবার বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ভুলিতেছে তখন তিনি মনে করিলেন দণ্ড ও পুরস্কার দিলে বুঝি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষা পাইবে। "সেইজন্য তিনি কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। ধরাশূর যে ২২ গাঞী ব্রাহ্মণকে কুলীনগণ্য করিয়াছিলেন বল্লাল তন্মধ্যে ৮ গাঞী ব্রাহ্মণকে মুখ্য কুলীন এবং অবশিষ্ট ১৪ গাঞী ব্রাহ্মণকে গৌণ কুলীন করিলেন। তিনি শ্রোত্রিয়গণের মধ্যে দোষ গুণের বিচার করিয়া তাঁহাদিগকে শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ও কষ্ট শ্রোত্রিয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। বল্লাল সেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও কৌলীন্য বিতরণ করেন। বল্লালের সময় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ৮ জন কুলীন, ৮ জন শুদ্ধ শ্রোত্রিয় (সৎ শ্রোত্রিয়) ও ৮৪ জন কষ্ট শ্রোত্রিয় বলিয়া গণ্য হয়। বল্লালের

কুলবন্ধনে সন্তুষ্ট না হইয়া কতকগুলি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সভাত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনের সহিত ষড়যন্ত্র করেন। বল্লালের ডোমকন্যা বিবাহাদি কারণে লক্ষণ সেনের সহিত বল্লালের বিবাদ হইয়াছিল। সেইজন্য ইহারা কৌলীন্য পান নাই। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ লক্ষ্মণ সেনের পক্ষাবলম্বী হইয়া কৌলীন্য লইতে যান নাই। লক্ষ্মণ সেনের আদেশে বারেন্দ্র কায়স্থ ও বৈদ্যগণ কৌলীন্য গ্রহণ করেন নাই। ঢাকুরে লিখিত আছে—বারেন্দ্র কায়স্থ বৈদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ। বল্লাল মর্য্যাদা নাহি লৈলা তিনজন॥ উৎপাৎ করিয়া রাজা না থুইলা দেশ। স্বস্থান ছাড়িয়া সব গেলা অবশেষ॥ তিনি দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণকে কৌলীন্য প্রদান করিয়া স্বপক্ষীয় অনেকের বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন। "সম্বন্ধ নির্ণয় গ্রন্থে প্রকাশ যে বেলা এক প্রহর মধ্যে যে সকল ব্রাহ্মণ বল্লালের সভায় আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে তিনি কৌলীন্য প্রদান করেন নাই। এক প্রহরের পর ও দেড় প্রহরের মধ্যে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা কৌলীন্য পাইয়াছিলেন। কিন্তু দেড় প্রহরের পর ও দ্বিপ্রহরের মধ্যে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা মুখ্য কুলীন বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। তিনি যে এইভাবে কৌলিন্য বিতরণ করিয়াছিলেন তন্মূলে তাঁহার এইরূপ যুক্তি ছিল যে যাঁহাদের সন্ধ্যাবন্দনায় অধিক সময় গিয়াছে তাঁহারাই বিলম্বে আসিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহাদেরই বৈদিক আচার অধিক ছিল। ঢাকুরে বর্ণিত আছেঃ—শূদ্রদ্ধে দিলাকুল কায়স্থ নিন্দিত। আপন প্রভুত্ব বলে করে অনুচিত"। তেজস্বী ব্রাহ্মণ রাজভট্ট বলিয়াছিলেন "আপনি বৈদ্য ; ব্রাহ্মণের কুলপ্রথা নির্ণয়ে আপনি কিরূপে অধিকারী। বল্লাল রাজভট্টের প্রগলভ বাক্য শ্রবণে অতীব ক্রুদ্ধ হন এবং সমস্ত ভট্ট ব্রাহ্মণকে তাঁহার রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। সেই ভট্ট ব্রাহ্মণের বংশধরগণই ভাট নামে খ্যাত। তাঁহারা এখনও বল্লালের দণ্ড ভোগ করিতেছেন।

বল্লাল সেনের পূর্ব্বে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান প্রচলিত ছিল। তিনি সেই প্রথা উঠাইয়া দেন। বল্লালের সময় হইতেই রাঢ়ী বংশধর রাঢ়ীয় বলিয়া ও বারেন্দ্রের বংশধর বারেন্দ্র বলিয়া গণ্য হইবার নিয়ম হয়। একদা বল্লাল একটী যজ্ঞ করিয়া কতকগুলি কুলীন ব্রাহ্মণকে একটী স্বর্ণধেনু দক্ষিণা দেন। ব্রাহ্মণগণ তাহা কাটিয়া বিভাগ করিয়া লয়েন। এই সংবাদ পাইবামাত্র ইনি সেই কুলীন ব্রাহ্মণগণকে পতিত করেন। যে সকল কুলীন ব্রাহ্মণ অর্থাদি লোভে সেই পতিত ব্রাহ্মণদের ঘরে বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহারা (আদি) বংশজ নামে খ্যাত হন। এই সকল পতিত ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহারা কুলাচার্য্যগণকে অর্থাদি দ্বারা বশীভূত করিতে পারিলেন তাঁহারা শ্রোত্রিয় মধ্যে গণ্য হইলেন। (বর্ত্তমান সমাজের ইতিবৃত্ত—শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র দাশ)। ইহার কিছুকাল পরেই ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সেনের পুত্র কেশব সেনের হাত হইতে বাঙ্গালার সিংহাসন তাঁহার ব্রাহ্মণমন্ত্রী পশুপতি মিশ্রের ষড়যন্ত্রে ও জ্যোতির্ব্বিদগণের শঠতায় বক্তিয়ার খিলিজীর করতলগত হইল। মুসলমানগণ ইসলাম প্রচারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজ সংশ্রমে আসিয়া কত ব্রাহ্মণ মোছলমানী রীতি রেওয়াজ শিক্ষা করিলেন, আজকালকার হ্যাটকোট বুট প্যাণ্টালুনের স্থানে তখন তাহারা চোগাচাপকান নাগড়াই পাজামা তহবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। রায় সাহেব রায় বাহাদুর উপাধির ন্যায়ই তখন ব্রাহ্মণেরা খাঁ, মজুমদার, ভৌমিক উপাধি ধারণ করিলেন। কুলীন ব্রাহ্মণগণ কুল ভ্রষ্ট হইয়াও কুল গরিমার আত্মশ্লাঘা ভুলিতে পারিল না। তখন কুলীন ব্রাহ্মণসমাজে শূকর মাংসও চল হইয়াছিল। সাবর্ণ গোত্রীয় শ্রীধরের পুত্র নীলকণ্ঠ তখন মনানন্দে শূকর ভোজন করিতেন যথা—ঘৃতে জরজর শূকর ভাজা। ভোজন করেন বামুন রাজা॥ ওরে বাপু নীলকণ্ঠ। কেমনে খাইলে শূকর ঘণ্ট? (দোষ তন্ত্র)। দনোজা

মাধব ব্যবস্থা করেন যে কুলীনগণ শ্রোত্রিয়গণকে কন্যা দান করিলে (কুল ভঙ্গ) বংশজ হইবেন। রাজা গণেশ বঙ্গের পাঠান নবাবকে নিহত করিয়া বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার অন্য নাম কংস নারায়ণ। ইনিই ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বঙ্গদেশে সর্ব্ব প্রথম দুর্গোৎসব করেন। তাঁহার কায়স্থ মন্ত্রী দত্তখাস কুলীন ব্রাহ্মণগণের অনাচার ও দুর্দ্দশা দেখিয়া গৌণ কুলীন গণের কৌলীণ্য লোপ করিলেন। কয়েকজন কুলীন ব্রাহ্মণকে উপাধ্যায় উপাধি প্রদান করিলেন। সেই সব ব্রাহ্মণই আপন গাঞীর সহিত "উপাধ্যায়" শব্দ যোগ করিয়া মুখোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শব্দে আত্ম পরিচয় দিতে লাগিলেন। দত্তখাস শ্রোত্রীয়গণের মধ্যেও ডিগ্রি ভেদ করিয়াছিলেন। ৪০ জন ব্রাহ্মণ রাজা গণেশের অন্যায় ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া রাঢ় ও উড়িষ্যার মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারাই মধ্যশ্রেণী বলিয়া পরিচিত। "আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শণম্। নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানম্ নবধা কুল লক্ষণম্" কুলীণদের মধ্য হইতে যখন কৌলীণ্যের এই নয়টী গুণের একটীও পাওয়া মুস্কিল, যখন কুলীণের মধ্যে গুণের পরিবর্ত্তে দোষের প্রাচুর্য্য তখন হোসেন শাহের রাজত্বকালে দেবীবর মিশ্র আবির্ভূত হন। তিনি গুণ বিচার করিয়া কুল বন্ধন করিতে গিয়া দেখিলেন লোম বাছিতে বাছিতে কম্বলই থাকে না। তখন তিনি দোষে দোষে মিলাইয়া কুল বন্ধন করিলেন। যমুনা উজান বহিল। "ইহারই নাম মেল বন্ধন। দোষ নাই যার। কুল নাই তার॥" দোষানামিহ মেলনাৎ সমুদিতা কুলজ্ঞেন বৈ (কুল তত্ত্বার্ণব ৫৯৫)। তিন প্রকার দোষে মেল হয়— জাতিগত, কুলগত ও শ্রোত্রিয়গত। কোচ, হাড়ী, যবন অন্ত্যজাদি জাতির সংশ্রব ঘটিলে জাতিগত দোষ হয়। রণ্ডিকা গমন, কন্যাবহির্গমন, বলাৎকার, নীচগৃহে বিবাহ, সগোত্র বিবাহ ইত্যাদি কুলগত দোষ।

সপ্তশতীদোষ ও গৌণ কুলীন সম্পর্কাদি দোষ হইলে তাহাকে শ্রোত্রিয় দোষ বলে। এইরূপ তিনি ৩৬টী মেল বন্ধন করেন। হরি কবীন্দ্র বিরচিত মেলবন্ধন কারিকায় লিখিত আছে—নানা দোষের একত্র মিলন হেতু মেলের উৎপত্তি। কুলীন সমাজে এই সময় অসংখ্য দোষ প্রবেশ করিয়াছিল তন্মধ্যে কয়েকটী নিম্নে লিখিত হইল। **ফুলিয়া মেল**—এই মেলে নাদা, ধাঁধাঁ, বারুইহাটী ও মুলুকজুরী দোষ আছে। ধাঁধাঁ নামক খালের নিকট হাসাই নামক এক মুসলমান থানাদার থাকিত। শ্রীনাথ চট্টের দুই অবিবাহিতা কন্যা সেই খালে জল আনিতে যায়। হাসাই তাহাদিগকে ধরিয়া বলাৎকার করে। সেই কন্যাদিগের মধ্যে একজনকে গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন। "অনাথ শ্রীনাথ সুতা ধান্ধাঘাট স্থলে গতা। হাসাই থানাদারেন যবনেন বলাৎকৃতা॥" (মেলমালা) শ্রীনাথ চট্টের ধাঁধাঁ দোষ। বারুইহাটী গ্রামের ব্রাহ্মণ কন্যাগণের অবারিত মুসলমান সংশ্রব হেতু ঐ গ্রামের ব্রাহ্মণ গৃহে কোন ব্রাহ্মণ বিবাহ করিলে পতিত হইত! দেবীবরের কল্যাণে বারুইহাটীর ব্রাহ্মণগণ কুলীন গণ্য হইলেন। **বল্লভী মেল**—সর্ব্বানন্দের কন্যা তপন গঙ্গোর সঙ্গে গুপ্ত প্রণয় করিয়া গর্ভবতী হন। ধরণী চট্ট সেই কন্যাকে বিবাহ করেন। ধরণীর সঙ্গে বল্লভ কুল সংশ্রবে আসেন। "দুই নারী উদর ভারী তারে করি বিয়া। ধরণী ধরিলেন ধরা দুই পিণ্ড পাইয়া॥" **সর্ব্বানন্দী মেল**—রাঘব গাঙ্গুলীর কন্যা অবিবাহিতা অবস্থায় কৈবর্ত্ত দ্বারা দুষ্ট হয় এবং ঘরের বাহির হইয়া যায়। গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কন্যাকে বিবাহ করে। রাঘব গাঙ্গুলীর সঙ্গে সর্ব্বানন্দের কুল হয়। **পণ্ডিত রত্নীমেল**—সূর্য্য ঘোষালের কন্যাগণ অবিবাহিতাবস্থায় নীচজাতি সংশ্রব ও ভ্রূণহত্যা দোষে দুষ্ট হয়। লক্ষ্মীনাথ গঙ্গ হাড়িনী লইয়া থাকিত। দৈত্যারির সঙ্গে তার কুল হয়। দৈত্যারি চট্ট বড়ূয়া জাতিয়া স্ত্রীলোক লইয়া দুষ্ট হয়। গোপাল বন্দ্য বেদিনী

লইয়া থাকিত। লক্ষ্মীনাথ যে কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন সে অবিবাহিত অবস্থায় নীচ জাতির এক পুরুষের সহিত দুষ্ট হয়। পণ্ডিত রত্নের পিতামহ (বিষ্ণু) উহাদের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ। **গোপাল ঘটকী মেল**—গোপাল ঘটকের রজক পরিবাদ এবং হাঁসান খাঁর হেঁড়াকুটী ভক্ষণ। গুনার্ণব চট্টের ধাঁধাঁ দোষ ও শৌণ্ডিকাভিগমন। **বিজয় পণ্ডিতী মেল**—এই মেলে কলু দোষ, ম্লেচ্ছ সংসর্গ ও বলাৎকার দোষ। **শতানন্দ খানি মেল**—ধোপা পরিবাদ ও যবন সংশ্রব। হৃদয় ব্যাকুল, মস্তক বিঘূর্ণিত, হস্ত অবসন্ন, লেখনী অচল, আর না। পাঠকগণ! "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" ও "ব্রাহ্মণ বিবৃতি" গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিবেন দেবীবরের মেলবন্ধনে কুলীনকুলে যে কালিমা লেপন হইয়াছে সমস্ত ভারত মহাসাগরের জলে ধৌত করিলেও তাহা বিদূরিত হইবার নয়। সেইজন্য কুলাচার্য্য নুলা পঞ্চানন বলেন:—দোষ দেখে কূল করে একি চমৎকার। অজ্ঞান কুলীন পুত্র কুলে হয় সার॥ দেবীবর মেলের মধ্যে ভাগ, ভাব ও যূথ এই তিন প্রকার শ্রেণী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎসমস্ত অতি ঘৃণাকারজনক বলিয়া আলোচিত হইল না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ **বল্লভী মেলে** ঋতুধ্বজী ভাবের কথা ইঙ্গিত করিতেছি। নরসিংহ মজুমদারের স্ত্রী ঋতুধ্বজ নামক এক হাড়ীর সঙ্গে ভ্রষ্টা হয়। তাহাতে যে কন্যা জন্মে তাহাকে ষষ্ঠীদাস চট্ট বিবাহ করে উহাতে ঋতুধ্বজী ভাবের উৎপত্তি। তাঁহার সহিত যাহার সম্পর্ক ঘটিল সে বল্লভী মেলে ঋতুধ্বজী থাক হইল।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদলে মেলবন্ধন না থাকিলেও দোষের প্রাবল্য ছিল। দোষ বা অবসাদ প্রাপ্ত কুলীনগণ উত্তম কুলীনের সহিত সংস্পর্শ করিলে তাঁহাদের দোষ (অবসাদ) বিদূরিত হয়। অবসাদপ্রাপ্ত কুলীনগণ যে যে থাকে বিভক্ত হন তাহাকে পটী বলে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে এক্ষণে ৮টী পটী প্রসিদ্ধ আছে। পটী মেলেরই অনুরূপ। **আনিয়াখানি** পটীতে যবন সংসর্গ আছে। **কুতবখানি** পটীতে দেখা যায় কুতব

খঁ নামে এক মুসলমান যে কন্যাকে বরণ করিয়াছিল তাহাকে মথুরা মৈত্র বিবাহ করিয়াছিলেন। **ভূষনা পটীর** ব্রাহ্মণগণ নীচজাতীয় স্ত্রীর সংশ্রবে দুষ্ট হইয়াছেন।" (বর্ত্তমান সমাজের ইতিবৃত্ত—শ্রীভাগবতচন্দ্র দাশ)। লালবিহারী কবিভূষণ লিখিয়াছেন, "বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের কুলীনের পটী বন্ধন এবং রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সমাজের কুলীনের মেলবন্ধনের মূলেও দুই এক স্থানে ভিন্ন জাতি সংশ্রব সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়" "বাঙ্গালী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ প্রচণ্ড, খাঁ ভাদুড়ী অথবা তাঁহার পুত্র পশ্চিম দেশীয়া রোহিলাখণ্ড নিবাসিনী এক ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সমাজে "রোহিলা পটী কুলীনের" উদ্ভব হইয়াছে। আর এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, জনৈক মৈত্র, একটি পরমা সুন্দরী মুসলমান কন্যাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া নাম ভূষনা রাখিয়া সেবাদাসী করিয়াছিলেন বলিয়া বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে "ভূষনা পটী" কুলীনের উৎপত্তি হইয়াছে। ডাকাত বেণী রায়ের দলের ব্রাহ্মণেরা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে "বেণী পটীর" কুলীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। বারেন্দ্র শ্রেণীর নিরাবলী পটীর কুলীন দোষশূন্য। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" বলেন—মথুরা চৌধুরীর কন্যাকে কুতব খাঁ নামা সোয়ার হরণ করিয়া লয়। মথুরা চৌধুরী কন্যাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া মৃত্যুঞ্জয় মৈত্রের সহিত তাহার বিবাহ দেন। ইহাতেই (বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলীন সমাজে) কুতবখানী পটী হয়। কামদেব ভট্টের পাঁচ কন্যাকে বাদশাহী সোয়ারে ঘেরিয়া লইয়া যায়। কামদেব ভট্ট ঐ পাঁচ কন্যাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া মৈত্র, সান্ন্যাল প্রভৃতিকে দান করেন।"……প্রবাসী লিখিয়াছেন অল্পদিন পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে নদীতে নদীতে নৌকা (ভরা) বোঝাই করিয়া ঘাটে ঘাটে মেয়ে ফেরি করিয়া বিক্রয় হইত এবং যে সব ব্রাহ্মণসমাজে বিবাহ যোগ্য কন্যার অভাব থাকিত, সেই সেই সমাজের বিবাহার্থ ব্রাহ্মণেরা সেই সব পিতৃপরিচয় হীনা, অজ্ঞাত কুলশীলা কন্যাদের মধ্য হইতে বাছিয়া ভাবী পত্নী ক্রয় করিত। এই সব

কন্যা অন্ত্যজ শূদ্র ও মুসলমান বংশ হইতেও সংগ্রহ হইত, কিন্তু কেহই তাদের পিতৃ পরিচয় জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক মনে করিত না। তারা ভরার মেয়ে ইহাই তাদের যথেষ্ট পরিচয় বলিয়া স্বীকৃত ছিল।......

বিক্রমপুরের রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সমাজেই ভরার মেয়ের বিয়ে প্রচলিত ছিল। বংশজ কন্যাগণের পণ এত চড়িয়াছিল যে হাজার বারশো ভিন্ন একটী কন্যা পাওয়া যাইত না।...মেয়ে দান করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ আত্মীয় সাজিয়া থাকিত। ভরার মেয়ে যে কি পদার্থ, তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না এজন্য প্রথমে কিছুকাল সমাজে লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিতে হইত, শেষে সমুদয় মিটিয়া যাইত। সহস্র টাকার পরিবর্ত্তে ৬০৲।৭০৲ টাকা দিলেই একটী মেয়ে পাওয়া যায়, এ সুযোগ কে ছাড়ে? কোনও স্থানেই ভরার মেয়ে বিবাহকারী ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে দূরীকৃত হইত না।...যে কোনও জাতির দরিদ্র বিধবা কন্যা অথবা পিতৃ পরিচয়হীনা কন্যা সংগ্রহ করিত, কুপথগামিনী স্ত্রীলোকও সংগৃহীত হইত, কিছুই বাদ যাইত না।......এই ভরার মেয়ে বিবাহে অমুক ব্রাহ্মণ ডুলী বেহারার মেয়ে, অমুক ব্রাহ্মণ তাঁতীর মেয়ে বিবাহ করিয়া ছিলেন।...কোন কোন মেয়ের কথাবার্ত্তায় সে মুসলমান কন্যা ও মুচির কন্যা বলিয়াও বুঝাইত।" আমরা বিক্রমপুরের অনেকের নিকট শুনিয়াছি যে ৩০ বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত ভরার মেয়ে বিবাহ প্রচলিত ছিল।" (মহাভার মঞ্জরী)। বংশজগণ কন্যা পাইতেন না বলিয়া বাধ্য হইয়া এইভাবে বিবাহ করিতেন। ইহাই হইল যখন বঙ্গের ব্রাহ্মণ সমাজের ইতিহাস, তখন আর জাতি ও কৌলিন্যের বৃথা গর্ব্ব করিয়া কি লাভ! চালুনী আর কত কাল সূঁচকে ঘৃণা করিবে! অন্যদিকে কুলীন ব্রাহ্মণদের মহা সুযোগ। তাঁহারা "দেবীবরের মেল বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বিবাহ দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন। মেলচ্যুতির ভয়ে কুলীনগণ কুলীন পাত্রে কন্যাদান করিতে

বাধ্য হইতেন। সুতরাং সমাজে পাত্রের অভাব হইল। কুলীন পুত্রগণ সুবিধা পাইয়া বরপণের দাবী করিতে লাগিলেন। সর্ব্বনাশকর পণ প্রথার মূল এই খানে। কথিত আছে একজন কুলীন ব্রাহ্মণের উপর বারোয়ারী পূজার ১২৲ টাকা চাঁদা ধরা হয়। সে ১২৲ টাকা অন্য কোন উপায়ে সংগ্রহ করিতে না পারিয়া ১২৲ টাকা বর পণে এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া সেই ১২৲ টাকা বারোয়ারীতে চাঁদা দেয়! (বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বিবৃতি)। সাধু ব্যবসায়! সাধু প্রবৃত্তি! সাধু কৌলীন্য! কুলীন সমাজে যে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল তাহা স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সেই বীরপুরুষের তেজে সে কুপ্রথা এক্ষণে পশ্চিম বঙ্গ হইতে তিরোহিত হইয়াছে। তিনি একবার হুগলী জেলার কুলীন ব্রাহ্মণ গণের বহু বিবাহের একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে লিখিত হইল :— ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, বয়স ৫৫ বর্ষ, বিবাহ ৮০টী। রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ৪০, বিবাহ ৩০টী। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ২০, বিবাহ ১৬টী। পূর্ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বয়স ৫৫, বিবাহ ৬২টী। আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ১৮, বিবাহ ১১টী। যদু নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ২২, বিবাহ ১৫টী। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বয়স ৬০, বিবাহ ৫০টী। ভগবান চট্টোপাধ্যায়, বয়স ৬৪, বিবাহ ৭২টী। রামময় মুখোপাধ্যায়, বয়স ৫০, বিবাহ ৫২টী।" (বর্ত্তমান সমাজের ইতিবৃত্ত)।

কুলীনগণ এইরূপ বহু বিবাহ করিয়া স্ত্রীগণকে শ্বশুর বাড়ীতেই রাখিতেন। অনেকে এক এক শ্বশুর বাড়ীতে ২।১ দিন করিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিয়াই জীবন কাটাইয়া দিতেন। বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে বাড়ীতে আনিয়া যদি ভরণ পোষণই করিতে হইল তবে আর কৌলীন্য কিসের ইহাই ছিল তাঁহাদের বদ্ধ মূল ধারণা। এই কুসংস্কারে ব্যাভিচার অবশ্যম্ভাবী। কৌলীন্য! ধন্য তোমার মহিমা। এই কৌলীণ্যের ওজুহাতে

মৃতব্যক্তি নিজেকে ব্রহ্মার প্রপৌত্র বলিয়া মনে করিতেছে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম নাশ করিবার জন্য কত প্রচেষ্টা; বিভিন্ন সময়ে বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারের কত ব্যবস্থা করা হইল! কিন্তু কালে চক্রে সমাজের এই ঘৃণ্য অবস্থা; তবুও শূদ্র দলন একটুও কমিলনা বরং ব্রাহ্মণ যতই অধঃপতিত হইতে লাগিল শূদ্রের উপর ততই বেগে অত্যাচার চালাইতে লাগিল।

বল্লালের চণ্ডনীতি।

দুইব্যক্তি বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে—বল্লাল সেন ও রঘুনন্দন। যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে এই দীপ্তিমান মহাপুরুষদ্বয়ের কীর্ত্তি বাঙ্গালীর স্মৃতিপটে উজ্জ্বল থাকিবে। লক্ষ লক্ষ নরনারীর বক্ষে ইহারা যে ঘৃণা, বিদ্বেষ, অপমান ও হিংসার কালাগ্নি জ্বালাইয়াছিলেন আজ ও তাহা তিল তিল করিয়া হিন্দু সমাজকে দগ্ধ করিতেছে। দুই মহাপুরুষই নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বঙ্গাধিপতি বল্লালসেন বৌদ্ধ ধর্ম্মত্যাগ করিয়া হলায়ুধ ও উমাপতি নামক দুই ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হন। হলায়ুধ বাল্ললের মন্ত্রী ও উমাপতি তাঁহার পঞ্চ রত্নের অন্যতম রত্ন। এই দুই ব্রাহ্মণের হস্তের ক্রীড়া পুত্তলী হইয়া বল্লাল ছলেবলে কলে কৌশলে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য স্থাপনে সমুদ্যত হইলেন। তাঁহার অনুষ্ঠিত অত্যাচার ও ব্যভিচারে দেশবাসী জর্জ্জরিত হইল। রাজা অত্যাচারী হইলে চিরদিনই এইরূপ হয়। ব্রাহ্মণের বশ্যতা স্বীকার করার নামই তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও রাজধর্ম্ম। বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রজাবৃন্দ আহার বিহার বিবাহাদি সর্ব্ব কার্য্যেই একতা ও প্রেমে আবদ্ধ ছিল তাই তখন দেশ স্বাধীন ছিল। বল্লাল এই বৌদ্ধ ধর্ম্ম রহিত করিয়া

দ্বেষ ঈর্ষা স্বার্থপূর্ণ ভেদোদ্দীপক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইলেন। ফলে দেশবাসী শত সহস্র জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত হইল, আত্মকলহ গৃহবিবাদের সৃষ্টি হইল, জাতিক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইল। বিদেশী এই সুযোগে বাঙ্গালা আক্রমণ করিল হিন্দুস্বাধীনতা লোপ পাইয়া মুসলমান রাজত্ব আরম্ভ হইল। আনন্দ ভট্টকৃত বল্লাল চরিতে দেখা যায়—নিশ্চিতং জারজঃ সোঽপি দুষ্কর্ম্ম মন্দবিস্তথা। চণ্ডাল ডোম কন্যাদৌ রতোঽসৌ সাধু পীড়কঃ॥ অর্থাৎ বল্লাল বিজয় সেনের জারজ পুত্র, এবং দুষ্কর্ম্ম পরায়ণ ডোম কন্যা ও চণ্ডাল কন্যায় আশক্ত ছিলেন। তিনি চালুক্য রাজকন্যা রম্নাদেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার রক্ষিত ব্রাহ্মণগণের প্ররোচনায় তিনি বৌদ্ধ প্রজাগণকে সেই সব ব্রাহ্মণের শিষ্য ও সেবক শ্রেণীভুক্ত করিতে আইন জারি করিয়া দেন। প্রজাগণ এত সহজেই রাজ আদেশ মত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল না। বল্লাল ঘোষণা করিলেন—বৌদ্ধালয়ম্বিশেং যস্তু মহাপত্স্বপি বৈ দ্বিজঃ। তস্য নিষ্কৃতি র্ণ দৃষ্টা প্রায়শ্চিত্ত শতৈরপি॥ "যে দ্বিজ মহাবিপদের সময়ও বৌদ্ধদের গৃহে যাইবে তাহার শত প্রায়শ্চিত্তেও নিষ্কৃতি দেখি না"। দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। প্রজাগণ রাজার সহিত সহযোগিতা বর্জ্জন বা ননকো-অপারেশন করিলে রাজা বৌদ্ধধর্ম্মকে অবৈধ বে-আইনি (illegal) বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যাঁহারা তাঁহার রাজ আইন অমান্য করিয়া ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়া রহিল—তিনি তাহাদিগকে পাতিত্যের দণ্ড দিলেন। সকলকেই পতিত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বল্লাল প্রদত্ত রৌপ্যমুদ্রার মহিমায় শাস্ত্রের নামে জালিয়াতী করিয়া প্রচার করিতে লাগিল—ব্রাহ্মণ বাদে বাকী সকলেই হীন, নীচ, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য ও সঙ্কর! ব্যাস সংহিতার নামে প্রচার করা হইল :—

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।
বণিক কিরাত কায়স্থ মালাকার কুটুম্বিনঃ॥

বরট মেদ চণ্ডাল দাস শ্বপচ কোলকাঃ।

এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যেচ গবাশনা॥

এবাং সম্ভাষনাৎ স্নানং দর্শনাদর্ক বীক্ষণম্। ১ অধ্যায়।

বর্দ্ধকী (সূত্রধর), নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক, কিরাত, কায়স্থ, মালাকার, কুটুম্বী, বরট, মেদ, চণ্ডাল, দাস, শ্বপচ (কুকুর ভোজী) ও কোল জাতি অন্ত্যজ এবং গো-খাদকের ন্যায় অব্যবহার্য্য। তাহাদের সহিত আলাপ করিলে স্নান করিতে হয় এবং তাহাদিগকে দেখিলে সূর্য্য দর্শন করিতে হয়।" কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসই যদি এই সংহিতার রচয়িতা হন তবে তাঁহার নিজের বেলা কিরূপ হইবে? তিনিও ত কৈবর্ত্তী কন্যা গর্ভজাত! যাজ্ঞবল্ক সংহিতায় কায়স্থকে প্রজাপীড়ক বলিয়া নিন্দা করা হইল "পীড্যমানাঃ প্রজারক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ ১।৩৩৬। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে ঘৃণ্যভাবে কায়স্থের চরিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে—কায়স্থে-নোদরস্থেন মাতুর্মাংসং নখাদিতং। তত্রনাস্তি কৃপাতস্য হৃদন্তৈব হি কারণম্॥ স্বর্ণকার স্বর্ণবণিক কায়স্থশ্চ ব্রজেশ্বর। নরেষু মধ্যেতে ধূর্ত্তা কৃপাহীনা মহীতলে॥ (ব্রঃ বৈঃ পুরাণ শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড ৮৫॥) কায়স্থ মাতৃ জঠরে আসিয়া মাতার মাংস খায়না কেন? উত্তরে বলা হইল শুধু দাঁত উঠেনা বলিয়া নতুবা তাহার দয়া সেখানেও নাই। স্বর্ণকার, স্বর্ণ বনিক ও কায়স্থ ইহারা পৃথিবীতে সবচেয় ধূর্ত্ত ও নির্দ্দয়।" শাস্ত্রের নামে কিরূপে জাতি বিদ্বেষ প্রচার করা হইল! ইতিহাস পাঠে জানা যায়—মধ্যভারত উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, বিহার, বঙ্গ ও উড়িষ্যার চিত্র-গুপ্ত কায়স্থগণ, মহারাষ্ট্র ও মধ্য প্রদেশের চান্দ্র সেণীয় কায়স্থগণ, কোঙ্কন ও মহারাষ্ট্রের চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় প্রভু কায়স্থগণ, করণ ও খণ্ডাইত কায়স্থ-গণ ইহারা সকলেই বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশধর। চিরদিন ইহারা রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। বল্লালসেনের পদলেহী, বৃত্তিভোগী পোষা পণ্ডিতগণের ঈর্ষা ও কুপরামর্শে ক্ষত্রিয় বংশধর কায়স্থগণও হীন অন্ত্যজ ও

শূদ্র আখ্যা প্রাপ্ত হন। এইরূপে অত্যাচারী গর্ব্বিত রাজা বল্লালের অন্যায় আদেশ অগ্রাহ্য করায় বঙ্গের বহু ক্ষত্রিয়কে তিনি শূদ্র, দাস বা গোলাম বলিয়া ঘোষণা করেন। মাহিষ্যগণ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যে ইঁহাদের কত কীর্ত্তি এখনও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। মাহিষ্মতীপুরী নির্ম্মতা হৈহয় বংশীয় মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ইঁহাদেরই পূর্ব্ব পুরুষ। এই বংশেরই রাজা অনঙ্গভীমের কীর্ত্তি—উড়িষ্যার জগন্নাথের মন্দির চির উজ্জল্য হইয়া রহিয়াছে। পোদ বা পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়গণ মহাভারতের যুদ্ধের সময়েও অঙ্গ বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশ শাসন করিতেন। রাজসূয় যজ্ঞের সময় দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া মহাবল মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে (মালদহে) পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় রাজা বাসুদেবের নিকট প্রতিহত হন। আগুরি বা উগ্র ক্ষত্রিয়গণ এক কালে সমগ্র অঙ্গ দেশের রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন। প্রাচীন কালে তাম্রলিপ্তে ইঁহারাই রাজধানী স্থাপন করেন। বাগ্দী বা ব্যগ্র ক্ষত্রিয়গণের রাজধানী বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরে। এখনও ইঁহাদের কীর্ত্তি চিহ্ন দৃষ্ট হয়। সমগ্র রাঢ়দেশে ইঁহাদের প্রাধান্য বিস্তৃত ছিল। কোচ বা খস ক্ষত্রিয়গণ উত্তর বঙ্গে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। পাঞ্চালবংশীয় ক্ষত্রিয়েরাও এক কালে ইঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাভূত হইয়াছিলেন। পাঞ্জাবের বহু রাজবংশীয় ক্ষত্রিয়, মল্লবীর ও যোদ্ধা এদেশে আসিয়া মালো বা ঝল্লমল্ল নামে পরিচিত ছিলেন। সৌরাষ্ট্র দেশের শুক্লী বা শোলাঙ্কী রাজপুতগণ মুসলমান অত্যাচারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আসায় বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। মগধ ও দাক্ষিণাত্যে ইহাদের রাজকীর্ত্তি এখনও দৃষ্ট হয়। রাজপুতানার বহু রাজু বা রাজপুত ক্ষত্রিয় পাঠান যুগে এদেশে আগমন করেন। এই সব বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়গণকে বল্লালসেন শূদ্র আখ্যা দেন ও যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করেন। মৃত্যু দণ্ডের ভয় দেখাইয়াও অনেকের যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করাইতে বাধ্য করে। বৌদ্ধপ্লাবনের মধ্যে ব্রাহ্মণ অনেকে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিলেও

ই সব ক্ষত্রিয় যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু রাজভক্ত ব্রাহ্মণের কুচক্রে ইহাদের যজ্ঞোপবীত ধারণ বন্ধ হইল। ক্ষত্রিয় দলন করিয়াই বল্লালের অত্যাচারের স্পৃহা নিবৃত্ত হইলনা। এইবার তিনি বৈশ্যদলনে প্রবৃত্ত হইলেন। ধান্য যব গোধূম দালকলাই বিক্রেতা খন্দ সাহা বা খন্দ বণিক, শঙ্খ-নির্ম্মিত-অলঙ্কার-বিক্রেতা শঙ্খ বণিক, গন্ধদ্রব্য-মশলা-বিক্রেতা গন্ধ বণিক, শুণ্ডাকৃতি যন্ত্র হইতে প্রস্তুত শুণ্ডামদ্য বিক্রেতা শৌণ্ডিক বা সুরা বণিক, কাংস্য পাত্র-বিক্রেতা কাঁসারী বা কাংস্য বণিক এবং স্বর্ণ-রোপ্য-মণি-মাণিক্য-বিক্রেতা সুবর্ণ বণিক এই পঞ্চ বণিকও বৌদ্ধ প্লাবনের ভিতর যজ্ঞোপবীত রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু বল্লাল ইহাদের যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিয়া শূদ্র বলিয়া ঘোষণা করেন। অন্যান্য বৈশ্য যাঁহারা বৌদ্ধযুগে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া ছিলেন তাঁহারা বল্লালের রাজত্বকালে যজ্ঞোপবীত গ্রহণের আন্দোলন করিয়াছিলেন কিন্তু বল্লাল পীড়ন করিরা সে আন্দোলন বন্ধ করেন। এইরূপে কৈবর্ত্ত, স্বর্ণকার, তেওর, জালিক, পাটনী বা লুপ্ত মাহিষ্য, সূত্রধর, কলু বা তেলী, রজক, বাউরী, দুলে, মালী ও কেওরা প্রভৃতি বৈশ্যগণ বল্লালের অত্যাচারেই যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে পারে নাই। এই সময় হইতেই বৈশ্য ক্ষত্রিয় নাম রাজ-আদেশে বিলুপ্ত হইল। হিন্দুগণ দুই জাতিতে বিভক্ত হইল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্র হইল। বল্লাল ঘোষণা করিলেন এইসব শূদ্রের গৃহে কোনও ব্রাহ্মণ পৌরহিত্য করিতে পারিবে না। কিন্তু উদার হৃদয় যে সব ত্যাগী ব্রাহ্মণ রাজ আদেশ অমান্য করিয়াও ইহাদের গৃহে যজন যাজন করিলেন বল্লালের উল্টা বিচারে তাঁহারা হীনত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদেরই নাম বর্ণব্রাহ্মণ। যুগীগণ ছিলেন বৌদ্ধদের পুরোহিত, তাঁহারা বৌদ্ধ তন্ত্র মতে শিব পূজা করিতেন। পুরোহিত বলদেব ভট্টের পরামর্শে বল্লাল ইহাদের যজ্ঞোপবীতা ছিন্ন করেন, শিবোত্তর সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন ও পতিত

বলিয়া ঘোষণা করেন বৌদ্ধ পুরোহিত যাঁহারা "ধর্ম্ম রাজের" পূজা করিতেন বল্লাল তাঁহাদের যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিয়া লোকালয় হইতে বহিষ্কার করেন। পশ্চিম বঙ্গের বহু স্থানে ইহারা গ্রামের বাহিরে আসিয়া এখনও বহু হিন্দুর গৃহে রক্ষিত ধর্ম্মরাজ বিগ্রহের পূজা করিয়া থাকেন। ইঁহারা এখন ডোম নামে পরিচিত। ধর্ম্ম শব্দের অপভ্রংশেই ডোম শব্দ উৎপন্ন। মহারাজ বল্লাল ডোম কন্যাকে মহাসমারোহে সাদরে বিবাহ করিয়া ছিলেন। এখন যাঁহারা নমঃশূদ্র ইহারাও বৌদ্ধগণের পুরোহিত ছিলেন বল্লালের অত্যাচারে ইহারাও যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মতে এখন যাঁহারা কর্ম্মকার, রোহিদাস ঋষি বা মুচি বলিয়া পরিচিত তাহারা সকলেই বিশ্বামিত্র ঋষির বংশধর সকলে বৌদ্ধদের পতনের সময় এই সব ব্রাহ্মণেরা তান্ত্রিক বেশে বৌদ্ধদের ভিতরে ঢুকিয়া ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণত্ব প্রচার করিতেছিলেন। বল্লালের অবিচারে ইঁহারা ব্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন কিন্তু ব্রাহ্মণের বহু আচার ইহাদের মধ্যে এখনও বর্ত্তমান। ব্রাহ্মণের ন্যায় ইঁহারা দশ দিনে অশৌচান্ত হন। বল্লাল এইসব বৌদ্ধ পুরোহিত, ও ক্ষত্রিয়ের জীবিকা ও বৃত্তি পর্য্যন্ত অপহরণ করেন। ইঁহারা বাধ্য হইয়া অনেকেই বৈশ্যের বৃত্তি ব্যবসায়, কৃষি ও গোপালন গ্রহণ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে থাকেন। গোপ, মালাকার, তিলি, তন্তুবায়, বারুজীবী, কুম্ভকার, কর্ম্মকার ও নাপিত ইহারা পূর্ব্বে কেহ কেহ ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণও ছিলেন। পরশুরামের ভয়ে বহু ক্ষত্রিয় বৈশ্য বলিয়া আত্মগোপন করেন। বল্লালের অত্যাচারে ইঁহাদের উপজীবিকা ও বৃত্তির পরিবর্ত্তন হয়।

নাপিত ব্রাহ্মণ বংশসম্ভূত, কর্ম্মকার ক্ষত্রিয় বংশসম্ভূত এবং অন্যান্য সকলেই বৈশ্য বংশসম্ভূত। ইহারা যখন বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে প্রবেশ করেন তখন ইঁহাদের নাম রাখা হইল নবশাখ। "গোপমালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী। কুলাল কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥

বৈশ্য নাম উঠাইয়া দিয়া বল্লাল এই নবশাখগণকে শূদ্র শ্রেণীভুক্ত করেন। যে সমস্ত তৈল ব্যবসায়ী বৈশ্য তখনও রাজার আদেশমত বৌদ্ধ ধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই তাঁহারা রাজার নিগ্রহ পূর্ণভাবেই ভোগ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা এখন কলু বা তেলী নামে পরিচিত। যে সমস্ত মালী বল্লালের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ ঘোষণা করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নিকট মস্তক কিছুতেই অবনত করিলেন না তাঁহারাও কঠোর দণ্ড প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের পুষ্পোদ্যান রক্ষণাবেক্ষণের অনায়াস সাধ্য জীবিকা অপহরণ করিয়া ক্ষেত্রে শস্য রক্ষণাবেক্ষণের আয়াস সাধ্য ভার দেওয়া হইল। তাঁহারা এখন ফুলমালী, ভুঁই মালী বা মালী নামে পরিচিত। এইভাবে বল্লাল ও তাঁহার পুরোহিত বলদেব ভট্টের কুটনীতিতে যখন অসংখ্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্র বলিয়া ঘোষিত হইল, যখন রাজার অত্যাচার অবিচারে প্রজাবৃন্দ জর্জরিত হইয়া উঠিল তখন দেশে বিপ্লব বা বিদ্রোহ দেখা দিল। রাজা বিপ্লব দমনের জন্য চণ্ডনীতির প্রয়োগ করিলেন, বিপ্লবের মুখে চণ্ডনীতি কার্য্যকরী হইল না। বলদেব ভট্ট ঘোষণা করিলেন—ব্রাহ্মণ বাদে সমস্ত অব্রাহ্মণ জাতিই সঙ্কর বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মনু সংহিতার দশম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—তিনটী কারণে বর্ণ সঙ্কর উৎপন্ন হয়। প্রথম—ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন বা ব্যভিচার। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, কর্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব মনুর মতে বর্ণ সঙ্কর। কারণ ইঁহারা কেহই পিতার ঔরসজাত পুত্র নহেন। দ্বিতীয়—অবেদ্যাবেদন অর্থাৎ সগোত্রা, বর্ণ শ্রেষ্ঠা কিংবা কোনও বিবাহের অযোগ্যা স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদন। মনুর মতে ব্যাস, পরাশর, বশিষ্ঠ, নারদ প্রভৃতি সকলেই বর্ণ সঙ্কর, কেননা ইঁহারা সকলেই বিবাহের অযোগ্যা স্ত্রীতে উৎপন্ন। তৃতীয়—স্বকর্ম্ম ত্যাগ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রগণের যে কেহ স্বীয় বর্ণোচিত কর্ম্ম ত্যাগ করিলে তিনি বর্ণ সঙ্কর। মহর্ষি মনুর মতে যে সব ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের কর্ম্ম বেদ পাঠ, ব্রহ্মবিদ্যা অর্জ্জন, যজন যাজন ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া কুক্কুরবৃত্তি চাকুরী গ্রহণ করিয়া-

ছেন কিংবা যে সব ব্রাহ্মণ উকালতি ডাক্তারী বা জমিদারী করেন তাঁহারাও সকলে বর্ণ সঙ্কর। বঙ্গদেশের বহির্ভাগে অন্যান্য প্রদেশে শতকরা ৮৫ জন ব্রাহ্মণ কৃষিজীবী; ইঁহারা বৈশ্যের বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন সুতরাং মনুর মতে বর্ণ সঙ্কর। পাচক গিরি করা মনুর মতে শূদ্রের বৃত্তি। শূদ্রের এই বৃত্তি অপহরণ করিয়া যাঁহারা রাঁধুনী বামুন হইয়াছেন তাঁহারাও মনুর মতে বর্ণ সঙ্কর। "ব্যভিচারেন বর্ণানামবেদ্যা বেদনেন চ। **স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণ সঙ্করাঃ**। মনু ১০।২৪। মনুর এই শ্লোক অনুসারে বিচার করিলে দেশে ব্রাহ্মণ পাওয়া গবেষণার বিষয়। কিন্তু বল্লালের গৃহপালিত বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণবাদে সকলকেই সঙ্কর বর্ণ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পরশুরাম সংহিতা নামক একখানি অর্ব্বাচীন গ্রন্থে বল্লালের অনুচরেরা প্রচার করিল—গোপের ঔরসে বারুজীবী, বারুজীবীর ঔরসে তেলী, তেলীর ঔরসে কর্ম্মকার, কর্ম্মকারের ঔরসে মালাকার, মালাকারের ঔরসে পট্টিকার, পট্টিকারের ঔরসে কুম্ভকার, কুম্ভকারের ঔরসে কুবেরী এবং কুবেরীর ঔরসে নাপিতের জন্ম হইয়াছে। এইরূপ কাল্পনিক বংশ বিবরণ প্রচার করিয়া পূর্ব্বকালে অনেকেই পাণ্ডিত্যের বাহাদুরী দেখাইতেন। গণিত ভূগোল ইতিহাস যাঁহাদের নিকট গোমাংস তুল্য এমন অনেক তর্কবিশারদ টোলের পণ্ডিত এখনও বলিয়া থাকেন—পৃথিবী ত্রিকোণাকৃতি, চন্দ্রের ভিতরে বুড়ী সূতা কাটিতেছে, রাহু দৈত্য চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস করে, শিব ঠাকুরের জটা হইতে গঙ্গার উৎপত্তি ইত্যাদি। এই সব মৌলিক গবেষণা দ্বারা অসংখ্য কুসংস্কারান্ধ দেশবাসীর নিকট হইতে ইঁহারা বাহাদুরী লইয়া থাকেন। পৃথিবী গোলাকার, চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবীর ছায়া সম্পাতে চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ হয়, হিমালয় পর্ব্বত হইতে গঙ্গার উৎপত্তি—এই সব টোল বহির্ভূত কথা শুনিলে ইঁহারা ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হন। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে আছে :—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্য কৃতঃ। উরূ তদস্য যদ্বৈশ্য পদ্ভ্যাং শূদ্র অজায়তঃ॥ ব্রাহ্মণ বিরাট জাতির মস্তক স্বরূপ, ক্ষত্রিয় বাহু স্বরূপ, বৈশ্য উরু স্বরূপ ও শূদ্র পাদস্বরূপ। এই রূপক বর্ণনা বুঝিতে না পারিয়া বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যেরা মূর্খসমাজে আসর জমাইয়া প্রচার করিলেন "ব্রহ্মা একদিন বিরাট হাঁ করিয়া মুখব্যাদান করিলে মুখ হইতে ব্রাহ্মণ পুঁথি পত্র হাতে ছিট্‌কাইয়া বাহির হইলেন, হাত ঝাঁকাইবার সময় ক্ষত্রিয় ঢাল তরোয়াল হাতে বাহির হইলেন, পা ছুঁড়িবার সময় উরু হইতে বৈশ্য পণ্য সম্ভার সমেত বাহির হইয়া বাণিজ্য করিতে ছুটিলেন ও পায়ের তালু হইতে শূদ্র তৈলপাত্র হাতে বাহির হইয়া ব্রাহ্মণের পদ সেবার জন্য ছুটিলেন। তাঁহারা এই প্রসঙ্গেই প্রচার করেন ব্রাহ্মণ উচ্চস্থান হইতে ও শূদ্র নিম্নস্থান হইতে উৎপন্ন অতএব শূদ্রকে ব্রাহ্মণের দাসত্ব করিতেই হইবে। ব্রাহ্মণ ও শূদ্র যে আজকাল একই স্থান হইতে উৎপন্ন হয় তাহা আর বিংশ শতাব্দীতে কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। ইঁহাদেরই মতে ব্রহ্মার পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ প্রজাপতির, বিষ্ণুর পদ হইতে পতিত-পাবনী গঙ্গার এবং ব্রহ্মার মুখ হইতে ছাগের জন্ম। ছাগের স্বজাতি হইতে বোধ হয় অনেক ব্রাহ্মণই ইচ্ছা করেন না; যখন গঙ্গা ও শূদ্রের উৎপত্তি একই স্থান হইতে এবং গঙ্গাজলে নারায়ণ পূজা চলিতে পারে গঙ্গাস্নানেও চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হইতে পারে তখন শূদ্রের স্পর্শে ছাপ্পান্ন পুরুষ উদ্ধার হইবে না কেন? মূর্খ সমাজে ইঁহারা এক একটী গাঁজাখুরী উপাখ্যান প্রচার করিয়া ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপন করিতে লাগিলেন "ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব পুরুষ অগস্ত্য ঋষি এক গণ্ডুষে সমুদ্র উদরসাৎ করিয়াছিলেন; ভৃগু ঋষি ভগবানের বুকে পদাঘাত করিয়াছিলেন, ভগবান তাহা সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়াছেন; ভগবানের এক নাম বিপ্রদাস অর্থাৎ ব্রাহ্মণের গোলাম। ব্রাহ্মণের প্রতি লোমকূপে ভগবান বাস করেন, ভগবান

রুষ্ট হইলেও নিষ্কৃতি আছে কিন্তু ব্রাহ্মণ রুষ্ট হইলে আর রক্ষা নাই; ভগবান ব্রাহ্মণের মুখ দিয়াই আহার করেন অতএব ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে ভগবানকে ভোজন করান হয়" এই সব ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য শুনিতে শুনিতে কোটি কোটি নরনারী ব্রাহ্মণাতঙ্ক রোগের কবলে পতিত হইল। বল্লাল ও বলদেব ভট্টের ষড়যন্ত্র এইখানেই শেষ হইল না। ভ্রষ্ট চরিত্র বল্লাল ছলে বলে কলে কৌশলে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইলেন। বল্লাল এক বিবাহিতা ডোমকন্যাকে অপহরণ করিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন এবং তাহার পাকস্পর্শ ব্যাপারে হিন্দু সমাজের সমাজপতি-গণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার এই নারীহরণ ও ব্যভিচারের পক্ষপাতী হইয়া যে সব পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ ও সমাজপতি সম্মতি দিয়াছিলেন ও ভোজন করিয়াছিলেন তাঁহারা কুলীন খেতাব পাইলেন। তখন রায় বাহাদুর, রায় সাহেব উপাধি আবিষ্কৃত হয় নাই। কবিবর যদুনন্দন কৃত "ঢাকুরে" লিখিত আছে—একদিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে॥ ত্যজিয়া বিপিন রাজা গেলা লোকালয়ে। তথায় বসতি করে ডোমের আশ্রয়ে॥ সেই রাত্রি তথায় রহিল উপবাসী। মিলিলেক ডোমকন্যা প্রাতঃকালে আসি॥ বিবাহ করিব বলি লৈয়া আইলা ঘরে। যেবা শুনে যেবা জানে শত নিন্দা করে॥ যদি কালক্রমে রাজা শুনে নিন্দাবাণী। সর্ব্বস্ব হরিয়া তারে তাড়ান তখনি॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনি করায় বিচার। শাস্ত্রমতে কার্য্যকরি কিদোষ আমার॥ "মহারাজ বল্লাল ডোমকন্যা বিবাহ করিয়া এবং তাহার হস্তে অন্ন গ্রহণ করিয়া ও জাতিচ্যুত হন নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" বলিয়া পাঁতি দিয়াছিলেন। এখনও দেশে সমাজ গর্হিত, শাস্ত্র বিরুদ্ধ, ধর্ম্ম নিন্দিত কর্ম্ম করিয়াও লোকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইতে পাঁতি সংগ্রহ করিতে পারে। এই ডোমকন্যাকে বল্লাল বিবাহ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাহাকে সমাজে চালাইবারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। "এই (ডোমকন্যা) পদ্মিনীর পাকস্পর্শ ব্যাপারে মহারাজ বল্লাল সেন

নিমন্ত্রণ করিলে বৈদ্যগণ তৎপুত্র লক্ষ্মণের উপদেশ অনুসারে স্বস্ব উপবীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। এই উপলক্ষে বৈদ্যগণের মধ্যে লক্ষ্মণী ও বল্লালী থাকের সৃষ্টি হয়। ডোমকন্যার পাকস্পর্শ ব্যাপার সত্য। কাহাকে লইয়া এই পাকস্পর্শ হইয়াছিল? প্রায় সকল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য মহারাজের এই সমন্বয় ব্যাপারের কোন না কোন প্রকারে সংস্পৃষ্ট ছিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থ এই অনাচার সহ্য করিতে পারেন নাই তাঁহাদিগকে দেশত্যাগ করিতে হইয়াছিল। "উৎপাত করিয়া রাজা না থুইলা দেশ। স্বস্থান ছাড়িয়া সবে গেলা অবশেষ॥" কৌলীন্য-গর্ব্ব-বিমূঢ় তুমি কুলীন, বল্লালের এই অশাস্ত্রীয় পতিত বিবাহকে ধর্ম্মের শিরে পদাঘাত করিয়া সমর্থন ও অনুমোদন করিয়াছিলে। তাহার ফলে গৌরবাত্মক উপাধি লাভ করিয়াছ। এখনও শিরে সেই কলঙ্ক রাশি বহন করিয়া জন সমাজে কুলীন বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছ! যাঁহারা বল্লালের এই দুষ্কার্য্যের সহায় ও সঙ্গী ছিলেন তাঁহারাই উচ্চ সম্মান লাভ করিলেন। একদা দুষ্ট বল্লাল রাজকোষে অর্থের অল্পতা হওয়ায় বিশেষ চিন্তিত হয়েন। ঐ সময় বাণিজ্যাদি দ্বারা সুবর্ণবণিক জাতি বিশেষ ধনবান হইয়া হইয়া উঠিয়াছিল। বল্লাল তাহাদের অনেকের নিকটে অনেক মুদ্রা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহাতেও রাজার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হওয়ায়, অবশেষে সুবর্ণবণিক জাতীয় মহাধনবান বল্লভানন্দ আঢ্যের নিকট পুনরায় প্রচুর অর্থ ঋণ স্বরূপে গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে [illegible]ণপুর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধের ব্যয় জন্য বল্লভানন্দের নিকট বল্লাল সেন পুনর্ব্বায় ঋণ প্রার্থনা করেন। পূর্ব্বপ্রদত্ত ঋণ এখনও পরিশোধ [illegible] নাই দেখিয়া বল্লভানন্দ বল্লাল সেনকে পুনরায় ঋণ দিতে অস্বীকার করেন কিন্তু রাজা তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। বল্লভানন্দ শাসন পত্রেও বশীভূত হইলেন না। তখন বল্লালসেন বল্লভানন্দের প্রতি নানাপ্রকার কটূক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন—সুবর্ণ বানিজ্যং স্বামী

বল্লভানন্দ নায়কঃ। আসীৎ দুষ্টো ধনশ্রেষ্ঠো রাজদ্রোহী চ গর্ব্বিতঃ॥ (গোপালভট্ট কৃত বল্লাল চরিত)। "বল্লভানন্দকে" হস্তগত করিতে অসমর্থ হইয়া বল্লালসেন ধনবান্ সুবর্ণ বণিকদিগের ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। "জহার বণিজাং বলাৎ। ব্যবহারে ধৃতং বস্তু কেষাঞ্চিৎ ক্রোশতামপি॥" অবশেষে যখন বল্লাল দেখিলেন সুবর্ণ বণিক জাতিকে একেবারে পর্য্যুদস্ত করা সহজ সাধ্য নহে, তখন তাহাদিগকে অপমানিত করিবার জন্য রাজবাটীর মহাভোজে নিমন্ত্রণ করিলেন। সুবর্ণ বণিকেরা উপস্থিত হইলে শূদ্রদিগের সহিত তাঁহাদিগকে উপবিষ্ট করিতে আজ্ঞা দিলেন। বণিকেরা কহিল আমরা বৈশ্য, বিশেষতঃ রাজবাটীতে আমরা ইতঃপূর্ব্বে বৈশ্যসঙ্গে একত্রে বসিয়া আহার করিয়াছি। সুতরাং এরূপ অসামাজিক ও অশাস্ত্রীয় আজ্ঞা পালন করিয়া শূদ্রের সহিত একত্র উপবেশন পূর্ব্বক আহার করিতে পারিনা। অতঃপর সুবর্ণ বণিকেরা ভোজনশালা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। রাজা বল্লাল সেন একথা শুনিয়া কহিলেন" কি ! এত বড় স্পর্দ্ধা !

"ঈদৃশী স্পর্দ্ধা! ইত্যুক্তা তানবাক্ষিপৎ" (বল্লাল চরিত্র) অল্প দিবস পরে, বল্লালসেন ক্রোধোন্মত্ত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন "যদি দুঃশীলান্ সুবর্ণ বণিজঃ অধম জাতীয়ানাং মধ্যে ন গণয়িষ্যামি, বল্লভানন্দস্য দুরাত্মনঃ সমুচিত দণ্ডবিধানং ন করিষ্যামি, তদা গো ব্রাহ্মণ যোষিদাদি ঘাতেন যানি পাতকানি ভবিতব্যানি, তানিমে ভবিষ্যন্তীতি। অন্ধরাজস্য শত পুত্র বিনাশায় ভীমসেনো যাদৃশীং প্রতিজ্ঞামকরোৎ, এতেষাং সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞামে তাদৃশী জ্ঞাতব্যা। যদি দাম্ভিক-বল্লভানন্দ-দুরাত্মানো দণ্ডং ন বিধাস্যামি তদা পাতকানি ভবিতব্যানি"। অর্থাৎ আমি যদি দুষ্ট স্বভাব সুবর্ণ বণিক গণকে নীচ জাতীয় মধ্যে ভুক্ত না করি, তাহা হইলে গোব্রাহ্মণহত্যার মহাপাতক হইবে। ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র বিনাশে ভীম সেনের প্রতিজ্ঞা যদ্রূপ, সুবর্ণ বণিক জাতি সম্বন্ধে আমার এই প্রতিজ্ঞা

তদ্রূপ—ইহা নিশ্চয় জানিবে।" ইহার কিছুদিন পর বল্লালসেন এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞোপলক্ষে সুবর্ণ নির্ম্মিত ধেনু ব্রাহ্মণ দিগকে দান করা হইয়াছিল। রাজা বল্লালের কুপরামর্শানুসারে একজন ব্রাহ্মণ একটা হিরণ্ময় গাভী শ্রীবিন্দ পাইন নামে জনৈক সুবর্ণ বণিক জাতীয় সওদাগরকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। শ্রীবিন্দ পাইন উহা ভগ্ন করিয়া অগ্নিতে দ্রব করিয়াছিলেন এবং তৎপরে সেই সুবর্ণ দ্বারা অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বল্লালসেন এইরূপ শ্রবণ করিয়া সভামধ্যে কহিলেন "ইহাতে নিশ্চয়ই গোহত্যার অপরাধ হইয়াছে, কেবল তাহাই নহে, অগ্নিতে গোদাহনের মহাপরাধ ঘটিয়াছে। অতএব সুবর্ণ বণিক জাতি অদ্য হইতে অধম শূদ্র জাতি মধ্যে গণ্য হইল।" এত দিনে প্রতিহিংসা পরায়ণ রাজা বল্লালের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। "অদ্যাবধি ক্রিয়াহীনানাং বণিজাং যজ্ঞোপবীত ধারণং ব্যর্থং এতেষাং ক্রিয়াভাবাৎ শূদ্রত্বং জাতম্। অতোদ্য পর্য্যন্তং এতে বণিজঃ শূদ্রাঃ, এতেষাং শূদ্রবৎ ক্রিয়াদিকং ভবিষ্যতি, বিশেষতস্ত স্বর্ণ বণিজঃ সর্ব্বে গোস্তেয়া গোহত্যা কারিণশ্চ তদেতে অদ্য পর্য্যন্ত পতিতাঃ শৈষ্টের গ্রাহ্যাঃ।" * এইরূপে বিনা অপরাধে বৈশ্য সুবর্ণ বণিক বল্লালের রাজ দণ্ডে "পতিত" বলিয়া ঘোষিত হইল। বঙ্গদেশের কোটি কোটি হিন্দু যাহারা শাস্ত্র মতে সকলেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য তাহারা দুশ্চরিত্র অর্থ লোভী ও অত্যাচারী রাজা বল্লালসেনের আদেশে ও কুটীল ব্রাহ্মণ বলদেব ও হলায়ুধের চক্রান্তে শূদ্র আখ্যা প্রাপ্ত হইল। সমাজ বিপ্লবে এইরূপেই দেশবাসীর ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। বল্লালের চণ্ডনীতি ও পাশব শক্তির দংশন বাঙ্গালার হিন্দু কখনও ভুলিতে পারিবে না। অত্যাচারী রাজার অন্যায় কর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া দণ্ড ভোগ এবং অনুমোদন করিয়া গৌরব লাভ চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে।

* পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ বিদ্যাভূষণ কৃত "জলচল" দ্রষ্টব্য।

রঘুনন্দনের ভেদনীতি।

বল্লালের চণ্ডনীতির কসাঘাতে ও কৌলীন্যের ব্যর্থ দাপটে অব্রা
হিন্দু নরনারী জর্জ্জরিতই হইয়াছিল, হীন বল হয় নাই। রাজশ
অবিচার অত্যাচার যতই চলিল নির্য্যাতিত জনরাশির প্রা
রুদ্ধ বারবাগ্নি ততই জ্বলিয়া উঠিল। পাশব শক্তির রক্ত আঁ
দেখিয়া বিক্ষুব্ধ প্রাণের তীব্র অকাঙ্ক্ষা দমিত হয় না বরং শতগুণে বর্দ্ধি
হয়। হিন্দু রাজত্ব শেষ হইয়াছে, মোছলমাণী আমলে নবদ্বীপে
কুলীনের গৃহে আবিভূর্ত হইলেন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন। সমা
রক্ষার অছিলায় তিনি যে অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব লিখিলেন সেই নব্য স্মৃতি
বজ্রবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া হিন্দু সমাজ বিকল জড় ও পঙ্গু হই
বল্লাল-প্রবর্ত্তিত কৌলীন্য প্রথায় হিন্দু সমাজের রক্তমাংস মেদ ম
নিঃশেষ হইয়াছিল। এইবার রঘুনন্দন হিন্দু সমাজের অবশিষ্ট জী
কঙ্কাল চর্ব্বণ করিতে ভেদ নীতির আশ্রয় লইলেন। ব্রাহ্মণ-প্রাধা
স্থাপনে বৃত হইয়া তিনি নবদ্বীপের টোলে বসিয়া শাস্ত্রের নামে জালিয়া
করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন "যুগে জঘণো দ্বেজাতী ব্রাহ্ম
শূদ্র এবচ ॥" জঘণ্য কলিযুগে মাত্র দুই জাতি ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। মোগ
ও পাঠান যুগে হিন্দু সংস্কৃত ভাষাকে যখন অবহেলা করিয়া উর্দ
ফার্শী ও আরবী শিক্ষায় ব্যস্ত তখন রঘুনন্দন শাণিত লেখনী
আঘাতে হিন্দু সমাজের বাহু ও উরুকে—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে ছেদ
করিলেন। সমাজ- দেহ কিম্ভূত কিমাকার বিকট আকার ধার
করিল। শুধু আছে ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র। মস্তকের সঙ্গে শু
দুইখানি পদ সংলগ্ন আছে। যে দেহে প্লীহা, যকৃত, পাকস্থলী
হৃৎপিণ্ড, ফুস্ ফুস্ উরু বা বাহু নাই সে দেহ জীবিত নহে মৃত
সাধারণ দেশবাসীর চক্ষুতে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া রঘুনন্দন নির্ম্ম

কাই বা জল্লাদের মতো সমাজকে হত্যা করিলেন। তাঁহার প্রখর পাণ্ডিত্যের উগ্র ঘুর্ণীপাকে বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখ হইতে মুচি, মেথর, ডোম, মুদ্দাফরাস পর্য্যন্ত সকলেই শূদ্র শ্রেণীভুক্ত হইল। ক্ষত্রিয় বৈশ্য কর্পূরের মতো বাতাসে উড়িয়া গেল। শূদ্র বাদে বাঙ্গালার কয়েকজন ব্রাহ্মণ নৈবেদ্যের থালিতে সন্দেশের মতো শোভা পাইতে লাগিল। অত্যাচারী ধূর্ত্তদের মনোরথ এইবার সিদ্ধ হইল। দেশ হইতে ক্ষাত্র শক্তি নিঃশেষ হইল দেশ রক্ষা করে কে? বৈশ্য শক্তি নিঃশেষ হইল দেশের ধনৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি করে কে? এইবার শুধুই ব্রাহ্মণ আর শূদ্র। ব্রাহ্মণ এইবার তাঁহার বিশ্বগ্রাসী বুভুক্ষা ও লেলিহান জিহ্বা লইয়া যজমানের সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে ব্যস্ত। ব্রাহ্মণের ক্ষিপ্ত উদরে যে ক্ষুধার অনল জ্বলিয়া উঠিল সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আহুতি দিলেও তাহা নির্ব্বাপিত হইবার নয়। যজমানের গৃহে বিবাহের আয়োজন চলিতেছে, ব্রাহ্মণ আসিয়া হাজির "আমাকে কিছু দাও"। বিবাহ রাত্রিতে, পঞ্চামৃতে, সাধ ভক্ষণে ব্রাহ্মণ আসিয়া হাজির "আমাকে কিছু দাও"। নামাকরণ, অন্নপ্রাসন চূড়াকরণ, পুষ্করিণী খনন, গৃহ প্রতিষ্ঠা, বিদেশ যাত্রায় ব্রাহ্মণ আসিয়া হাজির, "আমাকে কিছু দাও"। ইহাতেও ক্ষুধার নিবৃত্তি হইলনা। যজমান শ্মশান ঘাটে চলিয়াছে ব্রাহ্মণ দেবতা সেখানেও গিয়া হাজির কোথায় যাইতেছে? শেষ দেখা—আমাকে এইবার কিছু দিয়া যাও"। যজমান পুত্র মৃত মাতাপিতার শোকে সমাচ্ছন্ন, ব্রাহ্মণ আসিয়া হাজির এইবার পিণ্ডদান করিতে হইবে। এক পুরুষের পিণ্ডে চলিবেনা চৌদ্দ পুরুষের! একদিনে পিণ্ড দিলে চলিবেনা মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক, বার্ষিক ও দ্বাদশ বার্ষিক।" যেন যজমানের মৃত্যুতেই ব্রাহ্মণের পৌষমাস। যজমানের মৃতদেহ দেখিলে ব্রাহ্মণের জিহ্বাগ্রে জল সঞ্চার হয়। ব্রাহ্মণের ক্ষুধার তবুও নিবৃত্তি নাই। দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকায় কোথায় তাহার মৃতদেহে ক্ষতের চিহ্ন দেখা গিয়াছে, মরিবার পূর্ব্বে কাহার

মুখে রক্তস্রাব দেখা গিয়াছে, কে ক্ষয় কাশি বা যক্ষ্মা কাশিতে মরিয়াছে—এমন কি কাহার গৃহে কণ্ঠে রজ্জু সংলগ্ন মৃত গরু পড়িয়া আছে—মুখ ব্যাদান করিয়া ব্রাহ্মণ সেখানেই গিয়া হাজির "আমাকে কিছু দাও—প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।" যজমান আম খাইবে ব্রাহ্মণ আম ষষ্ঠীর ফর্দ্দ লইয়া হাজির; যজমান তাল খাইবে ব্রাহ্মণ তাল নবমীর মহিমা শুনাইতে আসিল; যজমান মূলা খাইবে ব্রাহ্মণ মূলা ষষ্ঠীর মাহাত্ম্য প্রচার করিতে আসিল; যজমান ঝিঙ্গা খাইবে ব্রাহ্মণ ঝিঙ্গা ষষ্ঠির গুণ গুণ শুনাইতে আসিল; যজমানের বাড়ীতে অশোক ফুল ফুটিয়াছে ব্রাহ্মণ অশোকাষ্টমীর ফলাফল বর্ণন করিতে আসিল। শুধু তাই নয়। যজমানের বাড়ীতে জামাই আসিয়াছে, ব্রাহ্মণ জামাই ষষ্ঠীর ব্রত কথা শুনাইতে আসিল; যজমানের বাড়ীতে ভগ্নী শ্বশুরালয় হইতে আসিয়াছে, ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার লম্বা তালিকা হস্তে আগমন করিল। এইখানেই শেষ নয়; শনিবারে শনিপূজা, রবিবারে সূর্য্য পূজা, সোমবারে চন্দ্র পূজা—এই ভাবে ব্রাহ্মণের সাতটী দিন যজমানের বাড়ীতে গ্রহ পূজাতেই কাটিয়া গেল; দেশে মরক আসিল—কলেরা লাগিয়াছে—ব্রাহ্মণ রক্ষাকালী পূজার জন্য উপস্থিত। বসন্ত লাগিয়াছে—ব্রাহ্মণ শীতলা পূজার জন্য হাজির; ম্যালেরিয়া টাইফয়েড জ্বর লাগিয়াছে, ব্রাহ্মণ জ্বরাসুর পূজার জন্য দেখা দিলেন। তবুও ক্ষুধা গেলনা। ব্রাহ্মণ ২২ কোটি হিন্দুর স্কন্ধে ৩৩ কোটি দেবতা চাপাইলেন। তৎসঙ্গে ষষ্ঠীদেবীর বিড়াল, ভৈরবের কুকুর, গণেশ ঠাকুরের ইন্দুর, শিবঠাকুরের ষাঁড়, শীতলা দেবীর গাধা, কার্ত্তিক ঠাকুরের ময়ূর, লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর পেচক, যমরাজের মহিষ, ব্রহ্মা ঠাকুরের হংস ও নারদের ঢেঁকী—এইভাবে আর ৩৩ কোটি আসিয়া হাজির। মোট হইল ৬৬ কোটি। ২২ কোটি হিন্দুর প্রত্যেকের ভাগে একটী করিয়া পড়িলেও রিজার্ভ ফণ্ডে থাকে ৪৪ কোটি। ব্রাহ্মণ দেবতা-পূজার জন্য উপযুক্ত ভোগের ব্যবস্থা করিলেন। অন্নবস্ত্র সমস্যায় প্রপীড়িত দীন দুঃখী দে

বাসীর নিকট হইতে তাহাদের হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমের এক এক বিন্দু রক্ত তুল্য পয়সা দেবপূজা বা দেবী পূজার নামে অলস শ্রমভীরু পরস্বাপহারী ব্রাহ্মণ নিজের পেট পূজার জন্য আদায় করিতে লাগিল। রঘুনন্দনের বরে ব্রাহ্মণ পরকালের ব্যবসায় দখল করিয়া বসিল। সমাজের অসংখ্য লোক কেহ কৃষকরূপে দিনরাত্রি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কৃষি কার্য্য দ্বারা সমাজ সেবা করিতেছে; কেহ তুলে বা বেহারারূপে পাল্কী বহন দ্বারা সমাজ সেবা করিতেছে; কেহ মেথর রূপে মলমূত্র পরিষ্কার করিয়া সমাজকে সেবা করিতেছে; কেহ ডোম রূপে মৃতের সৎকার করিয়া সমাজ সেবা করিতেছে, কেহ চূর্ণকার রূপে চূণ জোগাইয়া, কেহ কর্ম্মকার রূপে শিল্পকার্য্য দ্বারা, কেহ সূত্রধর রূপে গৃহের কারুকার্য্য করিয়া; কেহবা নাপিত রূপে ক্ষৌরকার্য্য দ্বারা যে কোনও উপায়ে প্রত্যেকেই পরিশ্রম দ্বারা সমাজকে সেবা করিয়া ধন্য হইতেছে ও বিনিময়ে তাহাদের জীবিকার সংস্থান চলিতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ ইহলোকের কোনও ব্যবসায়কেই তাহার জাৎব্যবসায় বলিয়া গ্রহণ করে নাই। সে অন্ধকারে স্বর্গ নরক পরলোকের ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছে। মূলধন নাই, সাক্ষী নাই, প্রমাণ নাই, পরিশ্রম নাই। কোনও রূপে যজমানের মাথায় কঁঠাল ভাঙ্গিয়া পিণ্ড চট্‌কাইতে পারিলেই তাহার ষোল আনা লাভ। শূদ্র জাতি বুঝিল ব্রাহ্মণের প্রত্যেক লোমকূপে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বাসা বাঁধিয়া আছে। তাই সে ব্রাহ্মণের শ্রীপদে তৈল মর্দ্দন করিয়া বা পাদোদক পান করিয়া সোজা পথে বৈকুণ্ঠে যাইবার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিতে লাগিল। রঘুনন্দন এইবার তাঁহার ভেদনীতির দ্বিতীয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। বৈদ্য কায়স্থ নবশাখ হইতে ডোম ম্যাথর পর্য্যন্ত সকলকে দ্বিজদাস, শূদ্র বা গোলাম বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তারপর শূদ্রের মধ্যে কাহাকেও সৎশূদ্র এবং কাহাকেও অসৎ শূদ্র বলিয়া নামাকরণ করিলেন। যেন গোঁদের

উপর বিস্ফোটক। সৎশূদ্র অর্থাৎ ভাল চাকর। এইবার রঘুনন্দনের ভেদনীতি সার্থক হইল। এই "গৌরবময়" শূদ্র উপাধির কলঙ্ক টীকা কপালে লাগাইয়া বৈদ্য ভাবিলেন—আমি কায়স্থ হইতে এক ইঞ্চি উপরে আছি। কায়স্থ ভাবিলেন—আমি তিলি, মালী, গোপ, কুম্ভকার, মোদক, নাপিত, বারুজীবি, তন্তুবায় ও কর্ম্মকার এই নবশাখ হইতে দেড়ইঞ্চি উপরে। নবশাখ ভাবিলেন আমি সাহা, সুবর্ণ বণিক, তেলী ও তাম্বুলী প্রভৃতি হইতে পৌণে দুই ইঞ্চি উপরে। সাহা সুবর্ণ বণিক প্রভৃতি মনে করিলেন আমরা কৈবর্ত্ত, কাপালী, নমঃশূদ্র হইতে পৌণে এক ইঞ্চি উপরে। ইঁহারাও মনে করিলেন আমরা মুচি, ডোম, ম্যাথর, প্রভৃতি হইতে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি উপরে। প্রত্যেকেই মনে করিলেন আমি অমুকের অপেক্ষা উচ্চ এবং অমুক আমা অপেক্ষা নীচ হীন। রঘুনন্দনের লেখনী আঘাতে যাঁহারা সকলেই শূদ্রত্বের লাঞ্ছণাময় শরশয্যায় শায়িত আজ তাঁহারা একে অন্যেকে হিংসা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের পদাঘাত ও কর্ণমর্দ্দন নীরবে গলাধঃকরণ করিয়া এক শূদ্র বা গোলাম অন্য শূদ্র বা গোলামের উপর অত্যাচার করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করিলনা। বৈদ্য ব্রাহ্মণের নিকট দশ কানমলা খাইলেন কিন্তু কায়স্থকে তের কানমলা দিয়া মনে করিলেন—তিন কানমলাই লাভ। কায়স্থ বৈদ্যের নিকট হইতে ষোল কানমলা খাইলেন কিন্তু নবশাখকে একুশ কানমলা দিয়া অনন্দে আত্মহারা! মনে করিলেন পাঁচ কানমলাই লাভ। এইরূপে প্রত্যেকেই একজনের নিকট কানমলা খাইয়া অন্যকে কানমলা দিতে পারিলেই নিজকে ভাগ্যবান মনে করিতে লাগিলেন। এইভাবে হিংসা বিদ্বেষে সমাজ বক্ষ ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল।

রঘুনন্দনের ইঙ্গিত অনুসারে ব্রাহ্মণগণ ব্যবস্থা করিলেন বিবাহ শ্রাদ্ধাদি সামাজিক ব্যাপারে শূদ্রের বসিবার স্থান ব্রাহ্মণের আসন হইতে

ক থাকিবে। ব্রাহ্মণের হুঁকায় শূদ্র তামাক খাইতে পারিবে না।
হ্মণের গৃহে সামাজিক ভোজনের পর শূদ্র-স্ত্রীপুরুষকে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার
রিতে হইবে। ব্রাহ্মণ শূদ্রের শবানুগমন করিলে ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইবে।
শানে শূদ্রের চিতাভস্মের নিকট ব্রাহ্মণের মৃতদেহ দাহ করা যাইবে না।
দ্রকে প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কারযুক্ত দীক্ষা-মন্ত্র দেওয়া হইবে না। "ওঁ"
লে নমঃ অর্থাৎ নমস্কার বলিবে। ব্রাহ্মণ শূদ্রের বাড়ীর দেব বিগ্রহকে
ণাম করিতে পারিবে না। শূদ্রের বাড়ীতে দেববিগ্রহ যে ভোজন
হণ করে ব্রাহ্মণ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। শূদ্রের বাড়ীর দেবতা
তিতে শূদ্র সুতরাং তাহার ভোগ খাইলে শূদ্রান্ন ভোজনের পাপ হয়।
হ্মণের বিগ্রহ ও প্রতিমাকে শূদ্র স্পর্শ করিলে বিগ্রহেরও জাতিপাত
—বিগ্রহকে পঞ্চগব্য বা গোবরচোনা পান করাইয়া তবে জাতিতে
যাইবে। ব্রাহ্মণের বাড়ীর শালগ্রাম শিলা শূদ্রের বাড়ীতে লইয়া গেলে
-গৃহ স্পর্শ হেতু সে শালগ্রাম শিলারও জাতি নষ্ট হইবে—এবারেও
াবর চোনার ব্যবস্থা। শূদ্রপ্রদত্ত ব্রত ভিক্ষা, দান, খাদ্যদ্রব্য বা জল
হ্মণের নিকট অগ্রাহ্য। অশূদ্র প্রতিগ্রাহী বলিয়া নিজেকে প্রকাশ্যে
ষণা করিয়া বহু ব্রাহ্মণ গৌরব প্রদর্শন করেন। শূদ্র যাজী পুরোহিত
"সৎ" ব্রাহ্মণগণের সামাজিক ভোজনে অপাংক্তেয় ও বিবাহাদি সামা-
ক ব্যাপারেও অগ্রাহ্য। শূদ্রের ও শূদ্রযাজী পুরোহিতের স্পৃষ্টজল
ৎ" ব্রাহ্মণগণের দেবকার্য্যে, সন্ধ্যাতর্পণাদিতে অব্যবহার্য্য। ব্রাহ্মণ
কে বেদ উপনিষদাদি পড়াইতে পারিবে না। শূদ্রকে স্পর্শ করিলে
নাদি দ্বারা শুদ্ধ হইয়া তবে সন্ধ্যা বন্দনাদি করিবে। সমাজে শূদ্রের জন্য
রূপ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। রঘুনন্দনের মতে বৈদ্য কায়স্থ এবং
শাখগণও শূদ্র বলিয়া এই অপমান হইতে রক্ষা পাইলেন
। রঘুনন্দনের ভেদনীতি আরও অগ্রসর হইল। রাজ অনুগ্রহে
বৈবাহিক সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া যেমন বহু পরাক্রমশালী রাজপুত

মোগল সম্রাট আকবরের পাদমূলে আত্ম বিক্রয় করিয়াছিল; এখনও তেমনই বহু শক্তিশালী, মেধাবী ও জ্ঞানী পুরুষ রায় বাহাদুর, রায় সাহেব, খাঁ বাহাদুর বা মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে সরকার বাহাদুরের নিকট বিক্রীত থাকিয়া চিরজীবন জড়ভরতের অভিনয় করিতেছেন। ব্রাহ্মণেরাও একবিন্দু জলের ঘুষ দেখাইয়া বৈদ্য, কায়স্থ ও নবশাখগণকে কিনিয়া লইয়াছেন। শূদ্র জাতির উপর যখন অত্যাচার চালাইতেই হইবে তখন ধনুর্ব্বাণ চাই। ব্রাহ্মণ এই তিন জাতিকে যৎ সামান্য অনুগ্রহ দেখাইয়া শূদ্র দিয়া শূদ্র দলনরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কায়স্থকে ধনু, বৈদ্যকে ধনুর ছিলা এবং নবশাখকে বাণ রূপে ব্যবহার করিলেন। এই জন্যই নবশাখের এক নাম নব"শায়ক"। বৈদ্য, কায়স্থ ও নবশাখগণও ব্রাহ্মণের ভেদনীতির আবর্ত্তনে পড়িয়া শূদ্র শ্রেণীভুক্ত। তাঁহারাও বেদ, ভগবান ও উপাসনা হইতে বঞ্চিত। শাস্ত্রের নামে ঋষির নামে ব্রাহ্মণের নিকট ইঁহারাও ঘৃণা, হেয় ও অবজ্ঞেয় বলিয়া অপকীর্ত্তিত। ইঁহাদের মধ্যে যখন কাহাকেও অপরাপর শূদ্রের প্রতি অবজ্ঞা, ঘৃণা ও বিদ্বেষের অনল বর্ষণ করিতে দেখি তখন হাসি পায়। পাঁচমন ময়দা ডলিবার অধিকার, ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শের অধিকার, বিল্বপত্র সংগ্রহ ও পুষ্পচয়নের অধিকার কিংবা ব্রাহ্মণের মস্তকের পক্ককেশ তুলিবার অধিকার পাইয়া ইঁহাদের আনন্দের সীমা নাই! শত শত বৎসরের অপমান নীরবে হজম করিয়া ইঁহারা মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন। কিন্তু লাঞ্ছনা ও অবমাননা লুকাইলে তাহা বিষব্রণের মতোই ফুটিয়া উঠে এবং ক্লেদবাহী দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি করে। ব্রাহ্মণগণ পূতনার মতো স্তনে বিষ লেপন করিয়া কায়স্থ, বৈদ্য ও নবশাখকে স্নেহ বাৎসল্য দেখাইতে গিয়াছিল কিন্তু যখন কায়স্থ বৈদ্য ও নবশাখগণের কেহ কেহ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে লাগিল তখনই পূতনার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পাইল। চারিদিক হইতে ব্রাহ্মণগণ চীৎকার করিয়া

উঠিল—"শূদ্রের যজ্ঞোপবীতে কোন ও দিনই অধিকার নাই।" তাই কায়স্থ, বৈশ্য ও নবশাখগণেরও আজ ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ ভক্তির অবসান ঘটিতেছে। দেবীভাগবতে এই সব কলির ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় "পূর্ব্বং যে রাক্ষসা রাজংস্তে কলৌ ব্রাহ্মণা স্মৃতাঃ। পাষণ্ড নিরতাপ্রায়ো ভবন্তি জন বঞ্চকাঃ॥ অসত্যবাদিনঃ সর্ব্বে বেদধর্ম্ম বিবর্জ্জিতাঃ। দাম্ভিকা লোক চতুরা মানিনঃ বেদবর্জ্জিতাঃ॥ শূদ্রসেবা পরাঃ কেচিন্নানা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকাঃ॥ অর্থাৎ পূর্ব্বযুগে যাহারা রাক্ষস ছিল তাহারাই কলিযুগে ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেইজন্য কলির ব্রাহ্মণগণ অধিকাংশই পাষণ্ড ধর্ম্মাবলম্বী, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, বেদোক্ত ধর্ম্ম বিহীন, দাম্ভিক, চতুর, অভিমানী, বেদজ্ঞান হীন ও অনার্য্য সেবী হয় ও নানাবিধ উপধর্ম্মের সৃষ্টি করে।" মহর্ষি বশিষ্ঠ ও পরাশর এইজন্যই ব্যবস্থা করিলেন "বেদপাঠহীন, মিথ্যাবাদী ব্রাহ্মণ যে গ্রামে ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে সেই গ্রামের অধিবাসিগণকে রাজা দণ্ড প্রদান করিবেন (পরাশর সংহিতা ১।৫৬ ও বশিষ্ঠ সংহিতা ৩ অধ্যায়)। রঘুনন্দনের ভেদনীতির প্রবর্ত্তনে আজ এইরূপ ব্রাহ্মণে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। ইহারাই রঘুনন্দনকে পুরোভাগে রাখিয়া ভেদ-বৈষম্য, ঘৃণা-বিদ্বেষ ও অনৈক্যের মন্ত্র প্রচার করিয়াছে। এক বিরাট বিশাল হিন্দু জাতি শত সহস্র মতমতান্তর, উপধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। তাই এই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হিন্দু জাতিকে এক মিলনের গ্রন্থিতে আবদ্ধ করা কবির কল্পনা বলিয়া বোধ হয়।

সমগ্র বিশ্ববাসীকে এক মিলনের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বেদ আদেশ করিলেন ওঁ সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্। দেবাভাগং যথাপূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥ (ঋগ্বেদ ৮।৮।৪৯।২) হে মনুষ্য! ধর্ম্মাত্মা বিদ্বানদের ন্যায় তোমাদের গতি এক হউক, বচন এক হউক ও চিন্তার ধারা এক হউক। ওঁ

সমানোমন্ত্রঃ সমিতি সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্। সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥ (ঋগ্বেদ ৮.৮।৪৯ ৩)। তোমাদের উদ্দেশ্য এক হউক, সামাজিক নিয়ম এক হউক, তোমাদের ইচ্ছা একরূপ হউক। তোমাদের জন্য এই সত্য উপদেশ প্রদান করিতেছি তোমরা এই মন্ত্রের সাধনা কর। ওঁ সমানীব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ। সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুহাসতি॥ (ঋগ্বেদ ৮।৮।৪৯।৪)। তোমাদের উৎসাহ উদ্যম সমান হউক, হৃদয় সমান হউক, মন সমান হউক, এইভাবে পরস্পর পরস্পরের সুখ শান্তি বর্দ্ধন কর। ওঁ সমানী প্রপা সহবোঽন্ন ভাগঃ সমানে যোক্ত্রে সহবো যুনজ্মি। (অথর্ব্ব ৬।৩।৩০) হে মনুষ্য! তোমাদের জলপান ও অন্ন ভোজন একসঙ্গে হউক। এই মন্ত্রের ভাষ্য করিতে গিয়া সায়নাচার্য্য লিখিতেছেন সহবোঽন্নভাগাঃ অন্নভাগশ্চ সহ এব ভবতু পরস্পরানুরাগবশেন একত্রাবস্থিত মন্নপানাদিকং যুষ্মাভিরুপভুজ্যতামিত্যর্থঃ॥ অর্থাৎ তোমাদের অন্নভোজন এক সঙ্গে হউক। পরস্পরের মধ্যে একতা ও প্রেম বৃদ্ধির জন্য একসঙ্গে বসিয় ভোজনাদি কর।

যে জাতির সিদ্ধান্ত এত উদার এত মহান্ আজ সেই জাতি কাহার স্পৃষ্ট জল গ্রহণ যোগ্য, কাহার স্পর্শে ভোজ্য দ্রব্য নষ্ট হয়—এই গবেষণায় মত্ত হইয়া পরস্পর বিরোধ করিতেছে। রঘুনন্দন বেদের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বেদ বিরোধী হিংসা বিদ্বেষের মন্ত্র দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তন করিয়া পাণ্ডিত্যের বাহাদুরী দেখাইলেন। এক জাতি, এক ধর্ম্মগ্রন্থ, এক ভগবান ও এক উপাসনা পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়াই পৃথিবীতে এক একটী বিরাট জাতি (Nation) গড়িয়া উঠে। আর্য্য জাতিও যখন এক বেদকেই তাহার জাতীয় গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিত, এক ভগবানে বিশ্বাস করিত, একই গায়ত্রী মন্ত্রে উপাসনা করিত তখন আর্য্য জাতি স্বাধীন ও সবল ছিল। সমগ্র

বিশ্বের উপর তখন তাহার জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রাধান্য বিস্তৃত ছিল। আজ সেই জাতি নষ্ট হইয়া দেশের মধ্যে বহুজাতির সৃষ্টি করিয়াছে। সমগ্র হিন্দু আজ ত্রিশ হাজার উপজাতিতে বিভক্ত। ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেই আজ সাত শত বিভাগ। পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান বন্ধ, এমন কি একের সহিত পানাহারাদি করিলে অন্যের জাতি নষ্ট হইয়া যায়। কাহারও পূর্ব্ব পুরুষ কবে কনোজে বাস করিত কিন্তু এখন পাঞ্জাবে বাস করিলেও সে রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বকালে বরেন্দ্রদেশে বাস করিত বলিয়া এখন বিলাতে থাকিলেও সে বিলাতী-ব্রাহ্মণ বারেন্দ্র বলিয়া পরিচয় দেয়। ব্রহ্মার মুখ হইতে বমন বা উদ্‌গার কালেই যদি ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয় তবে কি ব্রহ্মা সাত শত বার বমি করিয়া বা ঢেকুর ছাড়িয়া সাত শত প্রকার ব্রাহ্মণ প্রসব করিয়াছে? কি মূর্খতা! বৌদ্ধযুগের কিছুকাল পূর্ব্বেও সকলের সঙ্গে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে বিবাহের আদান প্রদান চলিত। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র তখন উপাধিমাত্র ছিল। আজ যেমন ডাক্তারের কন্যার সহিত উকীল পুত্রের কিংবা জমিদারের কন্যার সহিত অধ্যাপকপুত্রের বিবাহ অবাধে চলে তখনও তেমনই চারিবর্ণের পুত্র কন্যার মধ্যে অবাধে নিঃসঙ্কোচে বিবাহ আহার বিহার চলিত। এমন কি বৈদিক যুগে দ্বাদশ প্রকারে পুত্র সংগ্রহ করা হইত এবং ইহাদের উপনয়ন বিবাহ ইত্যাদি বৈদিক সংস্কারগুলি ধুমধামের সহিতই সম্পন্ন হইত। "ঔরস পুত্রিকাপুত্রঃ ক্ষেত্রজো গূঢ়জস্তথা। কানীনশ্চ পুনর্ভূজো দত্তঃ ক্রীতশ্চ কৃত্রিমঃ॥ দত্তাত্মা সহোঢ়শ্চ ত্বপবিদ্ধ সুতস্ততঃ। পিণ্ডদো ংশহরশ্চৈষাং পূর্ব্বাভাবে পরঃ পরঃ॥" (পারস্কর গৃহসূত্র ভাষ্যে হরিহর ধৃত স্মৃতি বচন)। (১) নিজের ধর্ম্মপত্নীতে নিজের দ্বারা উৎপন্ন পুত্রকে ঔরস পুত্র বলে। (২) নিঃসন্তান স্বামী পুত্রোৎপাদনে অক্ষম বা মৃত হইলে তাহার পত্নীতে জ্ঞাতি, সগোত্র বা ধর্ম্মপ্রাণ

পুরুষ দ্বারা উৎপন্ন পুত্রকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলে। বিচিত্র বীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু, পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র পঞ্চ পাণ্ডব এবং কল্মাষপাদের ক্ষেত্রজ পুত্র অশ্মক। (৩) কন্যার গর্ভজাত পুত্র আমার হইবে—এই সর্ত্তে বিবাহ দিলে সেই কন্যার পুত্রকে দৌহিত্র না বলিয়া পুত্রিকাপুত্র বলে। মান্দ্রাজ ও ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলে এখনও এ প্রথা বিদ্যমান। (৪) স্বামী ক্লীব পতিত উন্মাদ বা মৃত হইবার পর স্ত্রী অন্য পতি গ্রহণ করিলে তাহার গর্ভজাত পুত্রকে নূতন পতির পৌনর্ভব পুত্র বলে। (৫) বিবাহের পূর্ব্বেই যদি কুমারীর পুত্র উৎপন্ন হয় সেই কন্যাকে যে পুরুষ বিবাহ করিবে সে পুত্র সেই পুরুষের কানীন পুত্র হইবে। কর্ণ পাণ্ডুর ও বেদব্যাস শান্তনুর কানীন পুত্র। (৬) স্বামী গৃহে স্বামীর অজ্ঞাতে স্ত্রী যদি পর পুরুষ সংযোগে গর্ভবতী হয় সেই গর্ভজাত সন্তান সেই পুরুষের গূঢ়োৎপন্ন পুত্র। (৭) পিতৃগৃহে অবিবাহিতা অবস্থায় কন্যা গর্ভবতী হইলে সেই গর্ভজাত পুত্রকে সহোঢ় পুত্র বলে। (৮) কোনও অপুত্রক ব্যক্তি দান স্বরূপ অন্যের পুত্রকে গ্রহণ করিলে সে পুত্র তাহার দত্তক পুত্র হয়। এখনও দেশে এ প্রথা বিদ্যমান আছে। (৯) মূল্য দিয়া পুত্র ক্রয় করিয়া লইলে তাহাকে ক্রীত পুত্র বলে। এ প্রথাও দেশে বিদ্যমান আছে। শুনঃশেফ হরিশ্চন্দ্রের ক্রীত পুত্র। (১০) পিতৃ সম্বোধন করিয়া কোনও অনাথ বালক কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিলে সে বালক আশ্রয় দাতার স্বয়মাগত পুত্র। এ প্রথাও দেশে বিদ্যমান আছে। শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের স্বয়মাগত পুত্র। (১১) মাতাপিতা পুত্রকে পরিত্যাগ করিলেন সেই পুত্রকে পাইয়া যে প্রতিপালন করিবে সে তাহার অপবিদ্ধ পুত্র। কৃপাচার্য্য দুষ্মন্তের অপবিদ্ধ পুত্র। (১২) যে কোনও স্ত্রীতে যে কোনও পুরুষের উৎপাদিত পুত্রকে বিশেষণ হীন পুত্র বলে। বুধ চন্দ্রের ও ভরদ্বাজ বৃহস্পতির এরূপ পুত্র ছিলেন। তৎ-

কালীন সমাজে ইঁহারা কেহই হীন বা নীচ প্রতিপন্ন ছিলেন না। ভারতের সম্মানাস্পদ, প্রাতস্মরণীয় ও রাজপূজ্য ঋষি, পণ্ডিত ও মহা-পুরুষদের অধিকাংশেরই জন্ম বৃত্তান্ত এইরূপ। "জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্ত্যাঃ শ্বপাকাচ্চ পরাশরঃ। শুক্যাঃশুকঃ কণাদাখ্যঃ তথোলুক্যাঃ সুতোঽভবৎ॥ মৃগীজ ঋষ্য শৃঙ্গোঽপি বশিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ। মন্দপালো মুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকাপত্য উচ্যতে॥ মাণ্ডব্যো মুনি রাজস্তু মণ্ডুকী গর্ভ সম্ভবঃ। বহবোঽন্যেঽপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা যে শূদ্র যোনয়ঃ॥ (ভবিষ্য পুরাণ ব্রাহ্ম পর্ব্ব ৪২ অধ্যায়)। অর্থাৎ কৈবর্ত্ত কন্যার গর্ভে বেদান্ত দর্শন ও মহাভারত প্রণেতা বেদব্যাসের ন্যায় পণ্ডিতের জন্ম। শ্বপাক নামক অনার্য্য কন্যার গর্ভে ব্যাসদেবের পিতা পরাশরের জন্ম। ম্লেচ্ছ কন্যা শুকীর গর্ভে পরম ভাগবৎ শুকদেবের জন্ম। অনার্য্য কন্যা উলুকীর গর্ভে বৈশেষিক দর্শনকার কনাদের জন্ম। শূদ্র কন্যা মৃগীর গর্ভে রাজা দশরথের জামাতা ও পুরোহিত ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম। বেশ্যার গর্ভে হরিশ্চন্দ্র রামচন্দ্র প্রভৃতি ইক্ষাকু বংশীয় রাজাদের কুল পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের জন্ম। নাবিক কন্যার গর্ভে মন্দ পাল এবং হীন জাতীয়া মণ্ডুকীর গর্ভে মাণ্ডব্যের জন্ম। ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া-ছিলেন। পূর্ব্বকালে এইভাবেই জাতির কলেবর পুষ্ট হইত। আজকাল বশিষ্ঠ বা ব্যাসদেব হঠাৎ তাঁহাদের বংশধর আধুনিক ব্রাহ্মণদের বাড়ীতে অতিথি হইলে এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিবার অধিকার পাইবে তো? আধুনিক জাতিভেদ কোনও বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন-পুরুষ ঈশ্বর কৃত বলিয়া মনে করেন না। জাতিভেদ বিকৃত মস্তিষ্ক পুরুষদের কল্পনা মাত্র। এই কল্পিত জাতি ভেদ যতদিন থাকিবে ততদিন এক ভারতীয় জাতি গঠিত হইবে না। জাতিভেদ হিন্দু-মুসলমান মিলনের ও পরিপন্থী। মুসলমানের সহিত কোন্ জাতির মিলন হইবে? কায়স্থ জাতির না ব্রাহ্মণ জাতির? যতদিন এইসব উপজাতির সমাধির উপর হিন্দু জাতি

প্রতিষ্ঠিত না হইবে ততদিন মুসলমানের সহিত মিলন আকাশ কুসুম মাত্র।

বেদে স্বয়ং ভগবান উপদেশ দিতেছেন "যথেমাং বাচং কল্যাণীমা বদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায়চ স্বায় চারণায় চ॥" (যজুর্ব্বেদ ২৬।২)। অর্থাৎ হে মনুষ্য! আমি যেরূপ এই কল্যাণ কারিণী বেদের বাণী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও অন্যান্য সকলকেই প্রদান করিয়াছি তোমরাও সেইরূপ পরস্পরকে প্রদান কর। উপনিষদ, পুরাণ, সংহিতা, উপপুরাণ ও হিন্দুর ষড়দর্শন রচয়িতৃগণ এই বেদেরই অনুপন্থী। বেদই আর্য্য জাতির একমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ। কিন্তু ভারতের একদল স্বার্থপর ভণ্ড কোটি কোটি শূদ্র কথিত নরনারীকে বেদবিদ্যা হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য প্রচার করিতে লাগিল "বেদ মুপশৃন্বত স্রপু জতুভ্যাং শ্রোত্র-প্রতি-পূরণ মুদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীর ভেদঃ।" (গৌতম সংহিতা ১২ অধ্যায়) অর্থাৎ শূদ্রের কর্ণে যদি বেদমন্ত্র প্রবেশ করে তবে রাজা সীসক এবং জতু গলাইয়া তাহার কর্ণ-রন্ধ্র বুঁজাইয়া দিবেন, বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে জিহ্বা ছেদন করিবেন এবং যে অঙ্গে বেদমন্ত্র ধারণ করিবে সেই অঙ্গ ভেদ করিবেন। "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ (মনুসংহিতা ৪।৪৮) অর্থাৎ শূদ্রকে সাধারণ উপদেশও দিবেনা।" এইরূপ নিষ্ঠুর ঘোষণা বাণীর ফলে কোটি কোটি নরনারী বেদ, বিদ্যা ও উপদেশ হইতে বঞ্চিত হইল। যে এক ধর্ম্ম শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া এক বিরাট আর্য্য জাতি গড়িয়া উঠিয়াছিল আজ তাহা এই কারণেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইল। যখন যাহার ইচ্ছা হইল তিনিই ধর্ম্ম গ্রন্থের নামে এক একখানি স্বকপোল কল্পিত গ্রন্থ প্রচার করিতে লালিলেন। যখনই শূদ্র বেদপাঠের অধিকার প্রার্থনা কয়িয়াছে তখনই তাহাকে চণ্ডী, গীতা, ভাগবত, শনির পাঁচালী বা নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি দিয়া স্তোকবাক্যে ভুলাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

বেদপাঠ করিলে দেশে বিপ্লবের সৃষ্টি হইবে—এই মিথ্যা আশঙ্কায় বহু তথাকথিত দেশ-প্রেমিক গীতা বা চণ্ডী পাঠের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া শূদ্রের চক্ষুতে ধুলি নিক্ষেপ করিয়াছেন। ''বেদ বিরাট দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থ এবং গীতা বা ভাগবত জলের মতো সরল'' এই মিথ্যা বাক্য প্রচার করিয়া দেশবাসীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে এবং নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির পথ সুগম করিয়াছে। পৌরাণিক ধর্ম্মের ফাঁদ পাতিয়া প্রবঞ্চকেরা "মা কালী"র ঢং রচিয়া পাঁঠার মাংস, "বাবা শিবে''র ঢং রচিয়া গাঁজার কল্কি এবং যশোদা নন্দন শ্রীকৃষ্ণের নামে "যুগল উপাসনা"র প্রচলন করিয়াছে। বৈদিক মত সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইলে শিষ্য-যজমান, মঠ-মন্দির, লুচি-মোহন-ভোগ ও গয়া-বিষ্ণুপুরের তামাকু হাত ছাড়া হয়—এই তাঁহাদের আতঙ্ক। এক গায়ত্রী মন্ত্র ভুলাইয়া কাম গায়ত্রী, ক্রোধ গায়ত্রী, দুর্গা গায়ত্রী, গণেশ গায়ত্রী প্রভৃতি শত সহস্র তান্ত্রিক মন্ত্রের প্রচার করিয়াছে। এক বৈদিক-সন্ধ্যা-উপাসনা ভুলাইয়া শত সহস্র অবৈদিক উপাসনা পদ্ধতির প্রচলন করিয়াছে। গায়ত্রী উপাসনা ভুলিয়া কেহ মনে করিলেন মুক্তির জন্য এক "হরি" নামই যথেষ্ট। চুরি কর, ব্যভিচার কর, মিথ্যা কথা বল, অন্যের সর্ব্বনাশ কর—কোনও চিন্তা নাই! একবার "হরি" বলিয়া গড়াগড়ি দিয়া উঠ—সব পাপ তাপ কাটিয়া যাইবে। একবার কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে। জীবের সাধ্য কি যে তত পাপ করে॥ পাপ ক্ষয় করিবার এইসব হজমিগুলি বিনা মূল্যে দেশে দেশে বিলি হইতেছে। এই নাম মাহাত্ম্য প্রচারের ফলেই আজ মহাপাপীর প্রাণ হইতে মহাপাপের ভয় চলিয়া গিয়াছে। তাহারা কৃষ্ণনামের বর্ম্মে চর্ম্মে সজ্জিত হইয়া নির্ভয়ে পাপের পথে বিচরণ করিতেছে। কেহ মনে করিলেন—ব্রহ্মচর্য্য, সত্যনিষ্ঠা, শম, দম, জ্ঞান, কর্ম্ম বা ভক্তির কোনও প্রয়োজন নাই, সারা জীবন অপকর্ম্ম কর কোন ও চিন্তা নাই। একবার কোনওরূপে গঙ্গায় ডুব দিয়া পাপ ধৌত করিয়া আসিলেই চলিবে। কেহ

মনে করিলেন—শত পাপ করিলেও শমনের ভয় আর করি না। কণ্ঠে ও হস্তে হরি নামের মালা (Chaitanya Chain) ধারণ কর ; সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের তিলক, নক্সা ও ছাইনবোর্ড লাগাও, যমদূত দূর হইতে দেখিয়াই পলায়ন করিবে। কোটি কোটি দেশবাসী আজ এইভাবে আত্ম প্রবঞ্চনা করিতেছে। তাহারা ভুলিয়াই গিয়াছে—অবশ্যমেব ভোক্তব্যম্ কৃতংকর্ম্ম শুভাশুভম্। শুভ হউক অশুভ হউক কৃতকর্ম্মের ফল অবশ্যই তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। আজ ভগবদুপাসনার নামে ব্যভিচার, মদ্যপান, গঞ্জিকা-সেবন অবাধে সমাজে স্থান পাইয়াছে। রঘুনন্দন ভেদনীতির যে বিষবৃক্ষ বপন করিয়াছিলেন তাহা আজ ফলেফুলে সুশোভিত হইয়াছে। বেদমার্গ ভুলিয়া দেশবাসী আজ শূদ্রত্বের প্রভাবে শত সহস্র উপধর্ম্ম ও উপাসনার সৃষ্টি করিয়া কুসংস্কারের অন্ধকূপে মজ্জমান।

দাস-মনোভাব (Slave mentality)

আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের শাসনমঞ্চ হইতে যেদিন ক্রীতদাস নিগ্রোদের মুক্তিবাণী ঘোষণা করা হইল সে দিন সহস্র সহস্র ক্রীতদাস চীৎকার করিয়া উঠিল—"আমরা মুক্তি চাইনা ! পরাধীনতার মধুর বেষ্টনীতে আমরা বেশ শান্তিতে আছি ! আমরা স্বাধীনতার জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব না।" ইহারাই নাম দাস-মনোভাব। যে সব ক্রীতদাস এতদিন গো-মহিষ-ছাগ শিশুর মত হাটে বাজারে বিক্রীত হইত, যাহাদের মাতা ভগ্নীর সতীত্ব ছিল বিলাসী ধনীর বিলাসের উপকরণ, যাহাদের জীবন মৃত্যু ছিল মদগর্ব্বী স্বেচ্ছাচারী বণিকের বৈষয়িক সামগ্রী, সেই আজন্ম পরাধীন নিগ্রোজাতি স্বাধীনতার ভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

গোলামীর মাদকতা তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, পদলেহনের মোহ-মদিরা তাহাকে আত্মহারা করিয়াছে। যাহাদের মুক্তির জন্য আমেরিকার গৃহযুদ্ধে (Civil war) শত সহস্র তরুণ যুবক তাহাদের হৃৎপিণ্ডের উষ্ণরক্ত ঢালিয়া দিয়াছিল, আজ তাহারা মুক্তির মঙ্গল গীতি শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। তরুণের দল নির্ম্মম কষাঘাতে সেদিন নিগ্রোজাতির নিদ্রা ভঙ্গ করিয়াছিল; ক্রীতদাসদের সেদিন শিখাইতে হইয়াছিল—তাহারা স্বাধীন, তাহারা মুক্ত। তাহাদের জীবন দানবী শক্তির পদতলে নিষ্পেষিত হইবার জন্য সৃষ্ট নয়।" এইরূপে স্বাধীনতার রুদ্র ধ্বনি বৎসরের পর বৎসর শুনিতে শুনিতে তাহাদের আত্মচৈতন্য দেখা দিল। ভারতের বিরাট বিশাল শূদ্রজাতিও আজ কালনিদ্রায় নিদ্রিত। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ছিল মাত্র ছয় মাস কিন্তু এ জাতি শত শত বৎসর দাসত্বের কাল নিদ্রায় নিদ্রিত। কত মহাপুরুষ কম্বুকণ্ঠে এই জাতির জাগরণের রুদ্র আহ্বাণ শুনাইয়াছেন, কত সংস্কারক এই জাতির মুক্তি বেদীতে জীবন বলি দিয়াছেন—হৃদয় রুধিরে তর্পণ করিয়াছেন কিন্তু এ জাতি এখনও নিদ্রিত নিশ্চল নিথর। পরাধীনতার আত্মগ্লানি ইহাকে ব্যথিত করিতে পারে নাই। পদাঘাত, অপমান, ঘৃণা, ব্যঙ্গের বিষবাণ ইহাকে জর্জ্জরিত করিতে পারে নাই। দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার জন্য কত ধর্ম্মবীর আত্মাহুতি দিয়াছেন কিন্তু ইহারা সেই শৃঙ্খল হস্তপদে সযত্নে নিবদ্ধ রাখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছে। সুধু তাহাই নহে শৃঙ্খল মোচনে বাধা দিয়া ইহারা দাসত্বের জীবনকে কৃতার্থ করিয়াছে। সামাজিক দাসত্বের নাগপাশ জাতিকে বজ্র বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে। আজ চাই স্বাধীনতা—পূর্ণ স্বাধীনতা। রাজনৈতিক হউক, ধর্ম্ম নৈতিক হউক, সমাজ নৈতিক হউক, অন্ধ বিশ্বাস ও দাস মনোভাবকে নির্ম্মমের মত গলা টিপিয়া মারিতে হইবে। রাজনৈতিক পরাধীনতা একদিনে আসে নাই! এ দাস মনোভাব একদিনে জাতির মধ্যে সংক্রমিত হয় নাই। বংশপরম্পরায়

শৈশবকাল হইতেই অগণিত শূদ্র ক্রীতদাসের মতো ব্রাহ্মণের পাদোদক সানন্দে পান করিয়া আসিয়াছে। ব্রাহ্মণও শুনাইয়া আসিয়াছে শূদ্রন্তু কায়য়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা। দাস্যায়ৈব হি স্বষ্টোহসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥ মনু ৮।৪১৩। অর্থাৎ ক্রীত হউক অক্রীত হউক শূদ্রকে ব্রাহ্মণের দাসত্ব বা গোলামীর জন্যই ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন।” ব্রাহ্মণের নিকট হইতেই জাতি এই দাসত্বের বীজ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে। শৈশবকাল হইতেই শূদ্র জাতি শুনিয়া আসিতেছে “তুই নীচ, হীন, অভিশপ্ত জাতি। সেদিনও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত জলদ্ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন “শূদ্র জাতি চলমান শ্মশান। শ্মশান যেরূপ অপবিত্র শূদ্রও তদ্রূপ অপবিত্র! তবে পার্থক্য—শ্মশান নিশ্চল কিন্তু শূদ্র সচল।” অন্য একজন পণ্ডিত শূদ্রকে “অস্পৃশ্য অঙ্গের” সহিত তুলনা দিয়া ঘোষণা করিলেন শূদ্রগণ জাতির অস্পৃশ্য অঙ্গ বিশেষ। দেশ কাহাকে লইয়া? মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ লইয়া না কোটি কোটি শূদ্র লইয়া? এতদিন জনকয়েক উচ্চ জাতির স্বার্থ রক্ষার জন্য কোটি কোটি শূদ্রের স্বার্থকে বলি দেওয়া হইয়াছে। বেদ ব্রাহ্মণের, ভগবান ব্রাহ্মণের, পূজা ব্রাহ্মণের। শূদ্রের কিছুতেই অধিকার নাই। সে ব্রাহ্মণের নিকট ক্রীতদাস। দাসত্বের জন্যই তাহার জন্ম। তাহার মাতা যে ব্রাহ্মণের ক্রীতদাসী। শতধিক্ শূদ্রজাতি! শ্রাদ্ধ বিবাহাদিতে এখনও তোমার পিতামাতাকে অমুক দাসস্য, অমুকী দাস্যাঃ অমুক দাস অমুক দাসী বলিয়া পরিচয় দাও! শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা—হে অমৃতের পুত্রগণ! এই বলিয়া যাহাদিগকে উপনিষদের ঋষিগণ সম্বোধন করিয়াছেন আজ তাহারাই বিবাহে শ্রাদ্ধে মন্ত্র পড়িয়া থাকে “পাপোহহং পাপ কর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপ সম্ভবঃ” আমি পাপী, আমার কর্ম্ম পাপময়, আমার আত্মা পাপযুক্ত এবং আমার জন্মও পাপ হইতে! কি ঘৃণা! যাহারা নিজেকে পাপী বলিয়া পরিচয় দেয়, আত্মা ও কর্ম্মকে যাহারা পাপযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করে, জন্ম দাতা

পিতা ও গর্ভধারিণী মাতাকে যাহারা পাপ বলিয়া মনে করে তাহারা এই বিংশ শতাব্দীতে মানুস বলিয়া জগতে পরিচয় দিতে বিন্দুমাত্রও লজ্জা বোধ করে না! দাসত্বের ও পাপের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মাতাপিতাকে দাসদাসী বা পাপ মনে করিয়া শূদ্র জাতি আহ্লাদে আজ আত্মহারা। প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে গোলামীর বিষাক্ত রস প্রবেশ করিয়া তাহাকে ক্লীব কাপুরুষ পঙ্গু করিয়াছে। তাই দীর্ঘ-কাল-সঞ্চিত শূদ্রত্ব বা গোলামী পরিত্যাগে তাহার মমতা হয়। শূদ্রত্ব জনমের মতো বিসর্জ্জন দিয়া দ্বিজত্ব গ্রহণে—যজ্ঞোপবীত ধারণে এখনও অনেকে ইতস্ততঃ করিতেছেন এমন কি বাধা প্রদান ও করিতে-ছেন। এক শূদ্র বা গোলাম অপরকেও গোলাম করিয়া রাখিতে চায়। গোলামীর নেশায় বিভোর থাকিয়া সে সানন্দে অপরের পাদুকাঘাত হজম করিতেছে। ঘৃণা ও অপমানের বিনিময়ে সে পদলেহনের জন্য উদ্গ্রীব। বিলাতী কুকুরকেও ক্রোড়ে রাখিয়া যাহারা আদর করিয়া থাকে বিড়াল-ইন্দুর-কীট পিপীলিকা ও যাহাদের মন্দির ও রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতে পারে কিন্তু সরল প্রাণ সধর্ম্মী ভ্রাতার শরীরের বিযাক্ত হাওয়ায় যাহাদের অন্ন জল নষ্ট, মন্দির অপবিত্র এমন কি "দেবতার" জাতিপাৎ হয় তাহাদেরই উচ্ছিষ্ঠ ভোজন, পদরজঃ লেপন ও পদলেহন করিতে পারিয়া আজিও কোটি কোটি নরনারী নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছে। ধন্যরে দাস-মনোভাব!

যজ্ঞোপবীত-আন্দোলন।

যজ্ঞোপবীত আর্য্যত্বের বাহ্য চিহ্ন। পৃথিবীতে প্রত্যেক জাতিই কোনও না কোন বাহ্য চিহ্ন দ্বারা স্বীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। যখন অনার্য্যদের সঙ্গে আর্য্যদের তুমুল সংগ্রাম চলিয়াছিল তখন হইতেই

আর্য্যগণ উপনয়ন ধারণ করিয়া আসিতেছে। যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিলে কাহাকেও যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। এই-জন্য ইহাকে যজ্ঞোপবীত বলে। বালক গুরু গৃহে যাইবার পূর্ব্বে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিত। বৈদিক ষোড়শ সংস্কারের মধ্যে অন্ন-প্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি এক একটী সংস্কার। এই সব সংস্কার আত্মিক উন্নতির সহায়ক। প্রত্যেকেরই এই সব বৈদিক সংস্কারে পূর্ণ অধিকার আছে। যখন আর্য্যত্বের গৌরব ভুলিয়া যায়—বৈদিক আচার হইতে ভ্রষ্ট হয় কিংবা অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে তখনই আর্য্য-গণ যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করে। বাণপ্রস্থ বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিতে হয়। বৌদ্ধযুগে বৈদিক আচার ত্যাগ করিয়া আর্য্যগণ যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়াছিল এখন মুসলমান বা খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিতেছে। বৌদ্ধ যুগের অবসানে সহস্র সহস্র লোক যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছে। ঐতি-হাসিক পণ্ডিতদের মতে আর্য্য, অনার্য্য, মঙ্গোলিয়ান, দ্রাবীড় প্রভৃতি জাতির সংমিশ্রণে বর্ত্তমান হিন্দুজাতির উৎপত্তি। বিশুদ্ধ রক্তের দাবী করা হিন্দুর পক্ষে প্রলাপোক্তি মাত্র। বৌদ্ধযুগের পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি যজ্ঞো-পবীত গ্রহণ করিয়া গ্লানি ও অপমানকর শূদ্রত্ব পরিহার করিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতারক্ষার জন্য যে রাজপুত বীর নরনারী উষ্ণ রক্ত ঢালিয়া দিয়াছিল তাহারা শক, হুণ, আভীর, গুর্জ্জর প্রভৃতি জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন। তরবারির বলেই ক্ষত্রিয় বলিয়া তাহারা পরিচয় দিয়াছিল। মহারাষ্ট্র কেশরী শিবাজী জন্মিয়াছিলেন মহারাষ্ট্রের কৃষিজীবি "অস্পৃশ্য" ধাঙ্গর বংশে। তিনিও বাহুবলে নিজে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই আদর্শে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া কৃষক মারাঠা জাতি ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিল। এই মারাঠা জাতির দুর্দ্ধর্ষ শক্তির আঘাতেই প্রবল মোগল সাম্রাজ্য ভূপতিত হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী যজ্ঞো-

পবীত গ্রহণেচ্ছু মুসলমান খৃষ্টানকেও যজ্ঞোপবীত দিয়া বৈদিক ধর্ম্মে দীক্ষা দিতে লাগিলেন। এতদিন হিন্দুই মুসলমান বা খৃষ্টান হইত এখন যমুনা উজান বহিতে লাগিল। পাদ্রী ও মোল্লাগণ প্রমাদ গণিলেন। বাড়া ভাতে এইবার বুঝি ছাই পড়িল !

১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় পৌনে এক কোটি অহিন্দু আর্য্য সমাজের সাম্যবাদে আকৃষ্ট হইয়া বৈদিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। পাদ্রী মৌলবী-দের সঙ্গে "বামুন" দেবতাগণও চীৎকার করিয়া শুদ্ধি কার্য্যে বাধা দিয়াছিল। সমগ্র ভারতে আজ যজ্ঞোপবীত আন্দোলন বিস্তার লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণের অভিশাপ ও চীৎকার যজ্ঞোপবীত আন্দোলন বন্ধ রাখিতে পারিতেছে না। সকলেই যদি যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করে তবে হিংসা ও ঘৃণার অস্ত্র কাহার উপর চলিবে? এই ব্রাহ্মণের আতঙ্ক ! আপস্তব সূত্রে ঋষি ব্যবস্থা দিতেছেন "যস্য প্রপিতা মহাদে রুপনয়নং ন স্মর্য্যতে, তত্রার্থাদে তেষামপি পুরুষাণা মনুপনীতত্বং" তে সর্ব্বে শ্মশানবদ শুচয়ঃ তেষ্বাগতেষ্বভ্যুত্থানং ভোজনঞ্চ বর্জয়েৎ আপত্স্বপি ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তেষাং স্বয়মেব শুদ্ধি মিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তা নন্তরমু-পনয়নম্।" অর্থাৎ যে প্রপিতামহাদির সময় হইতেও যজ্ঞোপবীত হীন তাহারও অনুপনীতত্ব। সে শ্মশানবৎ অপবিত্র। তাহার আগমনে দণ্ডায়মান হওয়া ও তাহার হস্তে ভোজনাদি করা বিপদকালেও বর্জ্জনীয়। যদি সে নিজের শুদ্ধি ইচ্ছা করে তবে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া যজ্ঞোপবীত দান করিবে। মহর্ষি মনু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিতেছেন "কৃত্বা পাপং হি সংতপ্য তস্মাৎ তাপাৎ প্রমুচ্যতে। নৈবং কুর্য্যাং পুনারতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে ত সঃ॥ (মনুঃ ১১।২৩০) অর্থাৎ পাপ করিয়া অনুতপ্ত হইলেই পাপ হইতে সে উদ্ধার পায়। "আর এরূপ করিব না" এইরূপ বলিয়া নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হইয়া যায়। মহর্ষি যম নারীগণের যজ্ঞোপবীত সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"পুরাকল্পেষু নারীনাং মৌঞ্জীবন্ধ নমিষ্যতে।
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রী বচনং তথা॥"

পুরাকালে মহিলাগণ মৌঞ্জীবন্ধন বেদের অধ্যাপনা ও সাবিত্রী মন্ত্র গ্রহণ করিতেন।

আজ এই জাগরণের যুগে কে আছ কলির ব্রাহ্মণ! যজ্ঞোপবীত আন্দোলনে আর বাধা দিওনা। শ্রীভগবানের শুভ ইঙ্গিতে আজ জাতির প্রাণে স্বাধীনতার উন্মেষ দেখা দিয়াছে। এত দিন অজ্ঞাতসারে তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম, বেদ ভগবান, ইহকাল পরকাল সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছ। এই বার সাবধান হও। তোমার পাণ্ডিত্য, গবেষণা, বংশ গৌরব, দেবত্ব, জপ ও তপ হিন্দু জাতিকে বাঁচাইতে পারে নাই। বহুকালের জীর্ণ পচা-গলা ব্রাহ্মণ দ্বারা জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে না। আজ চাই কতক গুলি তরুণ তেজস্বী তাজা ব্রাহ্মণ। তোমার প্রাচীন জ্ঞান গরিমার যদি কোন সুকৃতি থাকে তবে এইবার জাতি গঠনের পূণ্য যজ্ঞে অর্পণ করিয়া ধন্য হও। না পার—জাতীয় অভ্যুত্থানের শুভ মূহুর্ত্তে অশুভ চীৎকার করিওনা—জাতি ও সমাজের বক্ষ হইতে অপসৃত হও।

যুদ্ধং দেহি!

হে ভারতের কোটি কোটি পদাহত শূদ্র! ব্যথিত গণশক্তি! সমাজের আসুরিক আভিজাত্য নির্ম্মম স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে দলিতা ফণিনীর মতো গর্জ্জিয়া উঠ। দানবী শক্তির নিষ্ঠুর বিধান ও কল্পিত শাস্ত্রের বর্ব্বর অনুশাসনের বিষদাঁত সমূলে উৎপাটন কর। বিপ্লবের রক্তনিশান অত্যা-চারীর বুকের উপর উড়াইয়া দিয়া ঘোষণা কর—যুদ্ধং দেহি! যুদ্ধং দেহি! অপমান অত্যাচারের রুদ্ধ ব্যথা তোমার হৃৎপিণ্ডে বাড়বাগ্নির মতো

জ্বলিয়া উঠুক ! শিরায় ধমনীতে বিদ্রূপের মর্ম্ম পীড়ণ তোমাকে আগ্নেয় গিরির তপ্ত ধাতুর মতো রুদ্রানলে দগ্ধ করুক। কে বলে তুমি ঘৃণ্য হেয় অস্পৃশ্য ? ঐ দেখ সমগ্র জগতে জাগরণের প্রলয়-বহ্নি মহাকাল মূর্ত্তিতে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তুমিও আজ জ্ঞানে গরিমায়, পাণ্ডিত্যে, প্রতিভায় মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের মতো জ্বলিয়া উঠ। অসত্য কপটতা, হিংসাদ্বেষ, ঘৃণা হিংসার বিষাক্ত আবর্জ্জনা ভস্মীভূত হউক। মুষ্টিমেয় স্বার্থপরের যাদুমন্ত্রে ভেল্কী বাজিতে এতদিন সুপ্ত সিংহের মতো অসার অচেতন ছিলে। এইবার ভণ্ডামি শঠতার উচ্চ সিংহাসন পদাঘাতে বিচূর্ণ কর। কেন তোমরা ঘৃণ্য হইয়াছ। কেন তোমরা ভীরু কাপুরুষ পশুর মতো অন্যের কৃপা ভিক্ষা করিতেছ ! তোমাদের দাস মনোভাবই তোমাদিগকে পরাধীন কাপুরুষ করিয়াছে। আজ ঘোষণা কর—বিপ্লবের বিজয় শঙ্খ সমাজের কোণে কোণে বাজাইয়া ঘোষণা কর—"আমরা মানিবনা অত্যাচারীর অন্যায় আদেশ, আর মানিব না আমরা গুরু পুরোহিত মোহান্ত পাণ্ডা গোঁসাই ব্রাহ্মণের ব্যর্থ ভ্রূকুটী। মনুষ্যত্বের অবমাননা পদাঘাতে চূর্ণ করিব।" ঘোষণা কর শূদ্র সিংহ—"যদি কোনও শঠ প্রবঞ্চক গুরুরূপে তোমার গৃহে বার্ষিক কর আদায় করিতে আসিয়া তোমাকে প্রচুর পরিমাণে উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ও পাদোদক পান করায় কিন্তু তোমার হস্তের বিশুদ্ধ অন্নব্যঞ্জন বা পানীয় জল গ্রহণেও কুণ্ঠিত হয়—তুমি সেই পাষণ্ড অর্থ লোভী ধূর্ত্তকে উত্তম মধ্যম শিক্ষা দিয়া গৃহ হইতে বিদায় কর। সে তোমার অর্থ অপহরণের জন্যই আসিয়াছে। ঘৃণার ব্যবধানে সে তোমাকে অতিদূরে রাখিয়াছে। এমন গুরুকে যত শীঘ্র সমুচিত শিক্ষা দিবে ততই তোমার মঙ্গল হইবে। যদি কোনও পুরোহিত তোমার গৃহে দেব পূজার নামে আসিয়া পেট পূজার জন্য অর্থ শোষণ করে কিন্তু তোমার মাতাপিতাকে "দেব দেবীর" স্থানে তোমার দ্বারা "দাস বা দাসী" বলিয়া সম্বোধন করায়, তোমার

বাড়ীতে দেবতার ভোগে সুপক্ক অন্নের পরিবর্ত্তে অপক্ক আতপ তণ্ডুল ব্যবহার করে, তোমাকে নিজে হাতে পূজা করিতে না দিয়া নিজেই এক রাত্রিতে ১০০ খানি কালী পূজা শেষ করে, তদ্দণ্ডেই সেই সব ধূর্ত্ত পাষণ্ডকে উচিত রূপে বিদায় কর। যদি কোনও মন্দির বা দেব বিগ্রহ তোমার অর্থ দ্বারা পরিপুষ্ট হয় কিন্তু তোমার প্রবেশ বা ছায়া স্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়—তবে সেই মন্দিরে প্রবেশ ও দেব পূজায় অধিকারের জন্য সত্যাগ্রহ অবলম্বন কর নতুবা মন্দিরের সহিত সর্ব্ব প্রকারে সহানুভূতি রহিত কর। শৈশব কাল হইতে সে মন্দির তোমার বুকের উপর বসিয়া জগতের সম্মুখে অপমান ও ঘৃণার তাণ্ডব লীলা চালাইয়াছে সে মন্দিরে পাথরের দেবতা দর্শন করিতে গিয়া তোমার হৃদয়ের জাগ্রত দেবতাকে অপমান করিও না। সংকীর্ণচেতা ও স্বার্থপর দের এসব মন্দিরেরদেবতা দেবতা নয়—ধূর্ত্ত ব্যবসায়ীদের জুয়াচুরির উপকরণ মাত্র। ঐসব মন্দির ভাঙ্গিয়া ফুটবল খেলার মাঠ বা ঘোড় দৌড়ের ময়দান প্রস্তুত করিলেও দেশের বহু উপকার হয়। তোমার স্পৃষ্ট অন্নব্যঞ্জন পানীয় জল যাহাদের নিকট অব্যবহার্য্য, তাহাদের স্পৃষ্ট ঐ সব ঘৃণা-অপমান-মিশ্রিত অন্ন জলাদি তুমিও প্রাণ গেলে গ্রহণ করিও না। তুমি ধনবান হইলে তোমার গৃহে সঙ্গোপনে অনেকেই আসিয়া অন্ন বা জল গ্রহণ করে। কিন্তু মনেও করিও না তাহারা তোমার স্নেহ ও সম্মানের জন্য অন্নজল গ্রহণ করে। তাহারা তোমার অর্থের সম্মান রক্ষা করিয়া যায়। যতক্ষণ তোমার সমাজের একটী ব্যক্তিও পদদলিত বা লাঞ্ছিত থাকিবে ততক্ষণ তুমিও পদদলিত ও লাঞ্ছিত। তুমি যদি কিল খাইয়া কিল চুরি কর তোমার দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পাইবে। যে তোমার গৃহে প্রকাশ্যে অন্নজল গ্রহণ করিবে না তুমিও প্রতিজ্ঞা কর তাহার গৃহে তুমি অন্নজল প্রাণান্তেও গ্রহণ করিবে না। ইহাকেই বলে নীতি শাস্ত্র। যদি এই জীবনসংগ্রামে

মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে চাও তবে "শঠে শঠ্যং সমাচরেৎ" এই নীতি বাক্য অবলম্বন কর। যে তোমাকে মধুর বচন কহিবে তুমি তাহার সহিত প্রেমালিঙ্গন করিবে, যে তোমার উপর ঘৃণাভরে অঙ্গুলি সংকেত করিবে তুমি তাহার প্রতি বজ্রমুষ্টি দেখাইবে। যে তোমার উপর ভ্রুকুটি দেখাইবে তুমি তাহার প্রতি রক্ত আঁখির তীব্র দৃষ্টি দেখাইবে। ইহার নাম হিংসা বিদ্বেষ নয়। ক্ষিপ্ত কুকুরের সম্মুখে "তৃণাদপি সুনীচেন" এই বৈষ্ণবাচিত দৈন্য দেখাইলে নির্ব্বোধ কুকুর হইতে দংশনই লাভ হইবে। যেমন কুকুর তেমন মুগুর—ইহাই হইল নীতি শাস্ত্রের উপদেশ। যে ব্যক্তি অত্যাচার বা অপমান করে সেও যেমন পাপী যে অত্যাচার বা অপমান নীরবে সহ্য করে সেও তেমনই পাপী। আজ বালক বালিকাদিগকে গায়ত্রীর অভয় মন্ত্রে দীক্ষা দাও। গৃহে গৃহে বেদ উপনিষদের সাম্যবাদ আলোচনা কর। এখনও যাহারা দ্বিজত্ব পরিহার করিয়া শূদ্রত্বের ঘৃণ্য—জীবন যাপন করিতেছে তাহাদের যজ্ঞোপবীত প্রদান কর—"পৈতার আতঙ্ক ও ব্রাহ্মণ-ভীতি অপসারিত হউক। সহস্র বৎসর ধরিয়া একগাছা পৈতার ওজুহাতে যে পাশবিক অত্যাচার ও শঠতার রাজ্য বিস্তার করিয়াছে—পৈতা গ্রহণ করিয়া "পৈতার" সেই দাম্ভিকতা নষ্ট কর। যজ্ঞোপবীতের সাম্যবাদ স্থাপন কর, নববলে বলীয়ান হইবে নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমে মনঃপ্রাণ প্রবুদ্ধ হইবে, পশুত্ব বিদূরিত হইবে। স্বহস্তে দেবার্চ্চনা কর। আর কতকাল পরের মুখে ঝাল খাইবে? তোমার স্থানে কি অন্যে ভগবানের নিকট কান্নাকাটী করিতে পারে? মন্ত্র নাই, তন্ত্র নাই, প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধার সাদর উপহার প্রদান কর তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন। আকুল প্রাণে ঐকান্তিকতার সহিত তাঁহার করুণার কথা স্মরণ কর—শুষ্ক হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া যাইবে। ভাড়াটীয়া পুরোহিত দ্বারা ভগবানের

পূজা করিলে কোনই ফল হইবে না। ভগবান তোমার ভক্তি তোমার নিকটেই আশা করেন—অন্য লোকের মারফতে তিনি তোমার ভক্তি আশা করেন না। ঘরে ঘরে শুদ্ধির মন্ত্র প্রচার কর। পৃথিবীর যে কোনও নরনারী যে কোনও ধর্ম্মে প্রবেশ করিবার অধিকার রাখে। যদি কোনও মুসলমান খৃষ্টান, নিগ্রো কাফ্রী এই বৈদিক ধর্ম্মে আসিতে ইচ্ছুক হয় গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া তাহাকে সাদরে গ্রহণ কর। কল্পিত জাতি ভেদের সিংহাসনকে পদাঘাতে বিচূর্ণ কর। অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ ও বিধবা বিবাহের প্রচলন দ্বারা নারী জাতিকে নিষ্ঠুর সমাজের হাত হইতে রক্ষা করিতেই হইবে। অস্পৃশ্যতারূপী মহারাক্ষস আজ শান্তি-নিকেতন এই হিন্দু সমাজে অশান্তির দাবাগ্নি জ্বালাইয়াছে। ইহাকে বিনষ্ট করিয়া মানব জাতির মধ্যে অবাধ আহার বিহারের প্রচলন কর। দেশ ও সমাজ নন্দনকাননে পরিণত হউক! হিংসা বিদ্বেষ চিরতরে বিনষ্ট হউক। বিপ্লবের পতাকা হস্তে পল্লীতে পল্লীতে গৃহে গৃহে এই মুক্তিবানী প্রচার কর। যদি কোন স্বার্থপর প্রবঞ্চক এই সাম্য প্রচারে বাধা দিতে আসে তাহাকে দেশদ্রোহী সমাজদ্রোহী বলিয়া জানিবে। সাম্যবাদের বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি নাই, পাণ্ডিত্য নাই, শাস্ত্র নাই। যে শাস্ত্র মানুষকে অধিকার হইতে বঞ্চিত করে সে শাস্ত্র মলমূত্রবাহী নর্দমায় নিক্ষেপ কর। মানুষ শাস্ত্রবিধির জন্য নহে—শাস্ত্রবিধিই মানুষের জন্য। সৃষ্টির পূর্ব্বে যেমন ধ্বংস চাই শান্তির পূর্ব্বে সেইরূপ বিপ্লব চাই। বিপ্লবের রুদ্র ঝঞ্ঝায় দেশও সমাজের জমাট বাঁটা বিষাক্ত বায়ু ছিন্ন বিছিন্ন হউক। রুদ্রদেবের উষ্ণ নিঃশ্বাসে নীচতাহীনতা ভেদাভেদ ভস্মীভূত হউক—জীর্ণ সমাজের চিতাভস্মের উপর নূতন সমাজকুঞ্জ গড়িয়া উঠুক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।